ধর্ম ও সমাজ

জর্জ টমসন

ধর্ম ও সমাজ

প্রকাশক
ভ্যানগার্ড প্রকাশনী
২৩/২ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশ কাল : মার্চ ২০২৫।

দাম : ২০ টাকা

লেখকের মুখবন্ধ

আমার একটি বক্তৃতাকে ভিত্তি করে এই প্রবন্ধটি লেখা। বক্তৃতাটি আমি গত কয়েক বছরে কয়েকবার করেছি। এই প্রবন্ধে ধর্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করার দাবি আমি করছি না-ধর্মের আদি উৎপত্তি এবং ঐতিহাসিক বিকাশের দিকে বিশেষ নজর রেখে ধর্ম সম্বন্ধে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য একটি বিবরণ উপস্থিত করার জরুরি তাগিদ মেটানোই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এটি প্রকাশযোগ্য করে তুলতে সাহায্য করার জন্য আমি আর এইচ হলটন ও আর এফ উইলেটকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জর্জ টমসন

বি. দ্র.—জর্জ টমসন বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিকভাষার অধ্যাপক এবং কেমব্রিজ কিংস কলেজের ভূতপূর্ব ফেলো।

ভূমিকা

অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশগুলোর মতো এদেশেও (ব্রিটেনে) ধর্মসংগঠনের প্রভাব. কমে আসছে। কিন্তু এখনও অনেক মানুষ আছেন যাঁরা গির্জায় যান না কিন্তু ঈশ্বরে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাঁদের ধারণা যে এই ঈশ্বর-বিশ্বাস জীবনের সব সংকট ও আপত-ব্যর্থতার হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করবে। এই বিশ্বাসই তাঁদের মনে শান্তি, সদিচ্ছা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম, সমাজসেবা প্রভৃ তি মানবীয় গুণগুলির উপর আস্থা বাঁচিয়ে রেখেছে। পক্ষান্তরে ধনবাদী সমাজে এই গুণগুলির জন্য যতই গলা ফাটিয়ে ওকালতি করা হোক না কেন বাস্তবে প্রতিদিনই এগুলিকে পায়ের নিচে মাড়িয়ে গুঁড়ো করা হচ্ছে।

খ্রিষ্টের অনুকৃতিতেই ঈশ্বর আমাদের সবাইকে গড়েছেন তবু আমাদের উপর এমন পশুর মতো ব্যবহার করা হয় কেন?' সামন্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ১৩৮১ সালে ইংরেজ কিসানরা এই আওয়াজ তুলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এই আওয়াজ বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে-লেভেলারদের বিদ্রোহে, ডিগারদের বিদ্রোহে, লুডাইটদের বিদ্রোহে-এই আওয়াজের মর্মবাণী আজও পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে। এ হচ্ছে ধর্মীয় কথার মধ্য দিয়ে সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আওয়াজ।

সেদিন সে কৃষকদের দমন করা হয়েছিল। তেমনি করেই দমন করা হয়েছিল লেভেলারদের, ডিগারদের, লুডাইটদের এবং ধর্মের নাম করেই তাঁদের দমন করা হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলো দমন করেছিল যে সমস্ত বিচারক, জেল দারোগা ও ফাঁসির জল্লাদেরা, গির্জার মহামান্য প্রধান পুরোহিতরা তাদেরই আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন। শাসক সম্প্রদায়ের হাতিয়ার হিসাবেই ধর্ম সব সময় ব্যবহৃত হয়েছে। সনাতনী সমাজব্যবস্থার অলঙ্ঘ্যনীয়তা রক্ষার জন্য একদিকে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে—'হে ঈশ্বর আমাদের এই আশীর্বাদ কর, আমরা যেন রাজার প্রতি ভক্তি রেখে, আইনের প্রতি আনুগত্য রেখে এবং পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব রেখে সকলে মিলে তোমার সেবা করতে পারি।' অন্যদিকে দুঃখের বোঝায় জীবন যাঁদের ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, যাঁরা অত্যাচারিত, তাঁদের এক পারলৌকিক জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কথা বলে প্রবোধ দেওয়া হয়ে থাকে ধর্মের নামে 'এই কথা ভুলো না এবং এই কথা বলেই পরস্পরকে সান্ত্বনা দিও যে, স্বর্গে তোমাদের জন্য স্থায়ী আনন্দের জীবন অপেক্ষা করছে।' সামাজিক সমস্ত অবিচারকে এইভাবে ধর্মের খোলস পরিয়ে লঘু করা হয়ে থাকে। ধর্মকে 'মানুষের জীবনের আফিম' বলে মার্কস এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। পূর্বাপর কথা থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর ঐ বাক্যাংশটির ইচ্ছাকৃতভাবেই কদর্থ করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—'ধর্মীয় দুঃখকষ্ট হচ্ছে একদিকে প্রকৃত দুঃখ-কষ্টেরই প্রকাশ, অন্যদিকে সেই বাস্তব দুঃখকষ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও বটে। ধর্ম হচ্ছে অত্যাচারিত জীবের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন দুনিয়ার করুণার কথা এবং ভৌতিক জীবনে আত্মার মোহ হচ্ছে ধর্ম। মানুষের জীবনে ধর্ম হচ্ছে আফিম।'

আজকের দুনিয়ায় ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা এই মতবাদে বিশ্বাসী যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা প্রকৃতির নিয়ম এবং ঈশ্বরের আইন অনুসারেই স্বীকার্য। তাই তারা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের

বিরুদ্ধে দুনিয়ার সব থেকে পাশবিক যে হিংস্র শাসনব্যবস্থা সেই ফ্যাসিবাদকে অবিরতভাবে সমর্থন করে চলেছে। ইংলন্ডিয় গির্জার প্রধান ধর্মযাজকেরাও অধুনা ক্যাথলিক মহাপ্রভুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চক্রান্তকারী ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচারে স্বর্গীয় আশিসবাণী বর্ষণ শুরু করেছেন। অন্যদিকে অবশ্য ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট উদ্ভট সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু খাঁটি খ্রিষ্টান রয়েছেন যাঁরা খ্রিষ্টের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই বিশ্বাসঘাতকতাকে সমর্থন করেন না, তাঁদের নামধারী নেতারা কিন্তু সেই কাজ করে চলেছেন। তাঁদের আসল প্রভুদের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যে এই ধর্মাধ্যক্ষরা গির্জার বেদি, সংবাদ বা বেতার প্রভৃতি প্রচারযন্ত্রের মারফতে অধম জনসাধারণের কাছে এই কথাই প্রচার করে চলেছেন যে, কমিউনিজম হচ্ছে খ্রিষ্ট-বিরোধী। কিন্তু কমিউনিজম যদি খ্রিষ্ট-বিরোধী হয় তাহলে খ্রিষ্টকে বলতে হয় ধনতন্ত্র। এই ধর্মনায়কদের কমিউনিজম-বিরোধী প্রচারের ফলে ধর্মপ্রচারের আসল যা উদ্দেশ্য অর্থাৎ তারা যেভাবে ধর্মকে ব্যবহার করতে চান সেই মতলব উলঙ্গ হয়ে পড়ছে। তারাই প্রমাণ করছে যে, ধর্মপ্রচারের আসল মতলব হলো শাসকশ্রেণির স্বার্থরক্ষা করা।

আসল সত্য হচ্ছে, দুনিয়ায় দুজন খ্রিষ্ট আছে। একজন হচ্ছেন গরিবের খ্রিষ্ট, যে খ্রিষ্টকে তারা নিজেদের দুঃখ বেদনার প্রতিমূর্তি ও তাদের মুক্তির, আশার প্রতীক হিসাবে পুজো করে এবং অপরজন হচ্ছেন শাসকশ্রেণির খ্রিষ্ট, যে খ্রিষ্টকে বড়লোকেরা ব্যবহার করে গরিবদের দিয়ে তাদের জীবনের আর্থিক শোষণ, সামাজিক ও আর্থিক সর্বনাশকে মানিয়ে নেবার জন্য।

ধর্ম আন্দোলনের এই দুই ধারা—প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা সমস্ত ধর্মেই আবহমানকাল ধরে চলে আসছে-খ্রিষ্টান শ্রমজীবী ভাইদের সঙ্গে ব্যবহারে আমাদের এই প্রগতিশীল ধারাকে চিনে নিতে হবে এবং তাঁদের আরও অগ্রসর হতে সাহায্য করতে হবে। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের দেখিয়ে দেওয়া যে, তাঁদের যে আদর্শ (সে আদর্শে আমরাও তাঁদের মতোই গভীরভাবে আস্থাবান)-শান্তি, শুভেচ্ছা, প্রতিবেশীর প্রতি প্রেম ও সমাজের সেবা—তাঁদের এই সব আদর্শ শুধু সক্রিয় আন্দোলনের জোরেই পূর্ণ করা যায়, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে সংগঠিত আন্দোলনের জোরে সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই শুধু সেই আদর্শে পৌঁছানো যায়।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

ধর্ম কথাটার ব্যাখ্যা করা যায় এইভাবে যে, এটি হচ্ছে এক ধরনের প্রক্রিয়া ও বিশ্বাস—যার মূল রয়েছে এই ধারণার মধ্যে যে এই বিশ্ব পরিচালিত হয় একটি অতিপ্রাকৃত শক্তি দ্বারা—যে শক্তির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বা বলিদান করে তাকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং জ্ঞানের দ্বারা নয়-বিশ্বাসের দ্বারাই যে শক্তিকে জানা যায়। আর বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া ও বিশ্বাস যার মূলে রয়েছে এই চিন্তা যে, এই বিশ্ব হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত বস্তুগত বিকাশপদ্ধতি এবং যে পরিমাণে মানুষ এই বিকাশপদ্ধতি জানতে পারে সেই পরিমাণে মানুষ তাকে প্রভাবিত করতে পারে। বিশ্বাসের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যে ঘটনাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে হয়, বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে তাকেই বস্তুগতভাবে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উপায়ে বিশ্লেষণযোগ্য ঘটনা বলে বোঝা যায়। ধর্ম বলে যে, ঈশ্বরের অনুকরণেই মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ধর্মের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে যে, মানুষ তার নিজের কল্পনা থেকেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে। এক ধর্ম যে আর এক ধর্ম থেকে বেশি সত্য এ কথা প্রমাণের কোনো ভিত্তি নেই। ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করেই সব ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। যদি তার কোনোটির মধ্যে সামান্য কিছু সত্য থাকেও তবে দেখা যাবে যে, সে সত্যটুকু বিজ্ঞানই তাকে মানতে বাধ্য করেছে। বিজ্ঞান হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান যা বাস্তবভাবে প্রামাণ্য। বিজ্ঞান তার শেষ সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছায়নি। বিজ্ঞান সব সময়েই ক্রমপ্রকাশমান। যে পরিমাণে বিজ্ঞান বিকাশলাভ করেছে সেই পরিমাণেই ধর্ম লোপ পাচ্ছে। কারণ জ্ঞান শক্তির জন্ম দেয় এবং মানুষ যে পরিমাণে তাঁর নিজের এবং তার পরিবেশের উপর ক্ষমতা অর্জন করেছে সেই পরিমাণেই তার ঈশ্বরের উপর আস্থার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের উপর আস্থা হচ্ছে মানুষের অজ্ঞতা এবং দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

এ কথা সত্য যে, বহু বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক ধর্মবিশ্বাসী এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিজ্ঞানের পরিধিকে সীমাবদ্ধ করে এই দুই চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করছেন। এটা হচ্ছে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকদের দুর্বলতারই প্রকাশ, যে দুর্বলতা জন্ম নিয়েছে বুর্জোয়াশ্রেণির ব্যর্থতার মধ্য থেকে। কারণ, ধনিকশ্রেণি আজ আর ধনতন্ত্রের অগ্রগতি বিধান করতে বা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমস্যা বুঝতে সক্ষম নয়। বুর্জোয়াশ্রেণির হাতে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পিছনে পড়ে গিয়েছে। বস্তুত বহু বুর্জোয়া ঐতিহাসিক ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলে মানতেই রাজি নয়। কারণটা খুব সহজ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের বাস্তব চিত্রটাই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা প্রস্তুত নন। তেমনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এটা যতই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ধনতন্ত্র এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, ততই বুর্জোয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘুরিয়ে ধরবার বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করে দার্শনিক ভাববাদ বা দুর্জ্ঞেয়বাদে আশ্রয়

নেবার একটি মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এদিকে শ্রমিকশ্রেণির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের মধ্যে বিজ্ঞানের সত্যিকারের নীতিগুলি নতুন করে বিবৃত হয়েছে এবং এই বিজ্ঞানের শ্রমিক-শ্রেণির কাছ থেকেই তার প্রেরণা পেয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বুর্জোয়াশ্রেণি যে জ্ঞান অর্জন করেছিল তাকে গ্রহণ করে এবং বৃদ্ধি করেই মার্কসবাদ সামাজিক বিশ্লেষণের ব্যাপারেও এই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করেছে। ধনতন্ত্রের জন্ম এবং বিকাশের ব্যাখ্যা করে মার্কস দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে-ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পথে সাম্যবাদে পরিবর্তিত হতে বাধ্য। মার্কসবাদের মধ্যে মানুষ এমন এক উপায়ের উদ্ভাবন করেছে যার সাহায্যে মানুষ ক্রমেই তার নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে তার সামাজিক সম্বন্ধ এমনিভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যার ফলে বাধামুক্তভাবে সে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রেণি-সংগ্রাম

মানবসমাজের ক্রমপরিবর্তন যতটা অগ্রসর হয়েছে তাতে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে উৎপাদন-পদ্ধতির সঙ্গে তাল রেখে সমাজে তিনটি যুগের বিকাশ হয়েছে শ্রেণি-পূর্ব সমাজ, শ্রেণিসমাজ এবং ভবিষ্যতের শ্রেণিহীন সমাজ।

শ্রেণি-পূর্ব সমাজে বা আদিম সাম্যবাদী সমাজে উৎপাদনের মান এতই নিচে ছিল যে ন্যূনতম জীবিকানির্বাহের পরিমাণ বজায় রাখার জন্য পুরো সমাজের চূড়ান্ত চেষ্টার প্রয়োজন হতো। তখন বাড়তি বলে কিছু থাকত না। একজনের পক্ষে আর একজনের শ্রমের উপর বসে খাওয়া তখন সম্ভব ছিল না। কারও কারও নিজের বিশেষ গুণের দ্বারা অর্জিত বেশি সম্মান ছাড়া তখন আর্থিক বা সামাজিক কোনো অসমতা ছিল না; উৎপাদনের পদ্ধতির যখন আরও অনেক অগ্রগতি হলো, যখন সমাজের আশু প্রয়োজন মিটিয়েও কিছু উদ্বৃত্ত থাকতে লাগল—তখন এক এক গোষ্ঠীর লোকের পক্ষে এক একটি শিল্প-পারদর্শী হওয়া সম্ভব হয়ে উঠল এবং এদের আহার জোগাতে লাগল তখন সমাজের বাকি লোকেরা এইভাবে যে শ্রম-বিভাগ হলো বলা চলে—তার ফলে উৎপাদন কৌশলে আরও উন্নতি হতে লাগল এবং পরিণতিতে গুণগতভাবে নতুন এক শ্রম-বিভাগের জন্ম হলো—প্রকৃত উৎপাদনকারী এবং উৎপাদনের সংগঠক এইভাবে ভাগটা হলো। উৎপাদন সংগঠনকারীরা হলেন প্রধান বা পুরোহিত, কৃষিকার্যে উন্নতির জন্য যে অঙ্কবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার প্রয়োজন হলো তাঁরা হলেন তার প্রথম অধিকারী। তাঁদের কাজের ধরন অনুযায়ী কর্তৃত্বের আসন তাঁদের দখলে এলো এবং কালে কালে এই সমস্ত উৎপাদন-তত্ত্বাবধায়কেরা নিজেদের মালিকে পরিণত করলেন। এইভাবে সমাজ দুই ভাগে ভাগ হলো—মেহনতী শ্রেণি ও শাসকশ্রেণি।

কাজেই এর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শ্রেণি-সমাজের আবির্ভাব হলো উৎপাদন প্রথায় অগ্রগতির ফলেই। শ্রেণিসমাজের পরবর্তী স্তরগুলো সম্পর্কেও একথা সত্য। ধনতন্ত্র বিশেষ করে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তিকে এত উচ্চতর স্তরে তুলেছে যাতে করে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজ আজ উৎপাদন শক্তির পরবর্তী বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর থেকেই বর্তমান কালে 'প্রাচুর্যের মধ্যে দারিদ্র্য-এই অস্বাভাবিক' অথচ সত্য ঘটনা উদ্ভুত হয়েছে। মুনাফার পরিমাণ বজায় রাখার জন্য কয়েকশত একচেটিয়া বড় মালিকের দ্বারা পরিচালিত ধনিকশ্রেণি মজুরি এত

কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়, যার ফলে দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ-মেহনতীশ্রেণি তাদের নিজেদেরই তৈরি জিনিস কিনতে আর সক্ষম হন না। এই যে অসামঞ্জস্য-এর একটিই মাত্র সুরাহা আছে- তা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ধ্বংস করে শ্রমিকশ্রেণিকে এক নতুন ধরনের রাষ্ট্রশক্তি তৈরি করতে হবে যাতে করে উৎপাদনের সমস্ত উপায় তারা নিজেদের হাতে নিয়ে ব্যক্তিগত মুনাফা ব্যবস্থার অবসান করতে পারে। এ ব্যবস্থার ফল কী হয় তা আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস থেকেই দেখতে পাই—এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কোনো মন্দার লক্ষণ থাকে না; পরন্তু সুসংবদ্ধ পরিকল্পনামূলক অর্থনীতির ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান ক্রমেই উন্নত হতে থাকেই। এইভাবেই মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান করে এই সামাজিক বিরোধের সমাপ্তি করা সম্ভব হয় যার ফলে নয়া সাম্যবাদের ভবিষ্যৎ শ্রেণিহীন সমাজের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

শ্রেণি-বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগ কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আনা হয়। এ কথা সত্য যে, ধনতন্ত্রের আওতায় অধিকাংশ সাধারণ মানুষকে জীবনে যে সব ধরনের শোষণ অত্যাচারে সামগ্রিক ও আত্মিক সর্বনাশে ভুগতে হয় সে সমস্তকে আমরা ঘৃণা করি। মানুষের জীবনে এগুলো অশুভ বলেই আমরা একে ঘৃণা করি এবং আমরা জানি শ্রমিকশ্রেণি যখন শোষণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং শোষকদের উৎখাত করতে উদ্বুদ্ধ হবে মাত্র সেই অবস্থাতেই এই শ্রেণি-বিরোধের অবসান হবে। লুঠেরা ও লুণ্ঠিতের মধ্যে 'ভ্রাতৃপ্রেম' প্রচার করা মহত্ত্ব নয়- শঠতা। ডিগারস্ আন্দোলনের নেতা জিরার্ড উইনস্ট্যানলি-যিনি তিনশ বছর আগে সারে-র্তে সেন্ট জর্জেস্ পাহাড়ে সাম্যবাদের পতাকা উড়িয়েছিলেন তাঁর কথাতেই বলি:

'সম্পত্তিই সারা দুনিয়ার মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে। সমস্ত যুদ্ধ, রক্তপাত ও দ্বন্দ্বের মূলেই এই সম্পত্তি। আবার যেদিন এই পৃথিবী সকলের সাধারণ ধনভাণ্ডারে পরিণত হবে-তা একদিন হবেই—সেদিনই দুনিয়া জোড়া এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা হবে।'

ধর্মের উৎপত্তি

শ্রেণি-পূর্ব বন্য মানুষদের জীবনের অধিকাংশটাই জুড়ে থাকত প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে এবং এই সংগ্রাম তখন তারা সবে মাত্র বুঝতে ও পরিচালনা করতে শুরু করেছে। তখন পর্যন্ত তাদের উৎপাদনের শক্তি অপরিণত এবং কৌশলও দুর্বল। অবশ্য এ সম্পর্কে তারা নিজেরা তখন সচেতন নয়। এই কৌশলের দুর্বলতা তারা মনে মনে পূরণ করতে চাইল ইন্দ্রজালের দ্বারা। ইন্দ্রজাল হচ্ছে এক মায়াবী কৌশল, যার দ্বারা তারা এক স্বেচ্ছাচারী ইচ্ছাশক্তির জোরে প্রকৃতিকে বশ করতে চেষ্টা করে।

শ্রেণিসমাজে প্রকৃতিকে মানুষ ক্রমান্বয়ে বুঝতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের বশে আনতে থাকে, কিন্তু মানুষের সমাজই তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে বিভক্ত হয়ে গেছে। শাসকশ্রেণি তখন নিজেদের বিশেষ অধিকারগুলোকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহের রং চড়িয়ে বেশি করে কায়েম করার জন্য ইন্দ্রজাল কৌশলের সৃষ্টি করতে থাকে। এইভাবে মেহনতি শ্রেণি তাদের পর-পদানত জীবনের আসল কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় ধর্মবিশ্বাসের। শ্রেণিসংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এই যে ইন্দ্রজালের সৃষ্টি, তারই পরিবর্ধিত রূপ হচ্ছে ধর্মমত। সামাজিক বাস্তবতার এটি হচ্ছে একটি উলটো ছবি। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে আদিম মানুষের দুর্বলতা যেমন রূপ নিয়েছে ইন্দ্রজালের ঠিক তেমনি সমাজের অগ্রগতির সামনে

সভ্য মানুষের দুর্বলতা রূপ নিয়েছে ধর্মবিশ্বাসের।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, প্রার্থনা অনুষ্ঠান বা বলিদান এইগুলোই হচ্ছে ধর্মানুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। আদিমতম যে সমস্ত বন্যমানুষের কথা আমরা জানি তাদের কোনও ঈশ্বর নেই-কোনও প্রার্থনা বা বলিদান প্রথাও তাদের নেই। আজকের সভ্য মানুষের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষদের কথা যেখানেই আমরা জানতে পারি সেখানেই আমরা এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছাই যেখানে না আছে কোনো দেবতা না কোনও প্রার্থনা বা বলিদানের প্রথা। এই স্তরে আমরা যার কথা জানতে পারি তা হচ্ছে ইন্দ্রজাল।

ইন্দ্রজালের কৌশল হচ্ছে এই যে, বাস্তব ঘটনাকে বশ করার ধোঁকা সৃষ্টি করেই যেন প্রকৃতপক্ষে বাস্তবকে বশ করা যায়। প্রাথমিক স্তরে ইন্দ্রজালের প্রায় সবটাই ছিল অনুকরণ। বৃষ্টির প্রয়োজন হলে ঘনায়মান মেঘ, বিদ্যুৎচমক ও বৃষ্টিধারার অনুকরণে নাচের অনুষ্ঠান কর। কল্পনায় ঈপ্সিত বস্তুর কামনা পূরণের অনুষ্ঠান কর। এই অনুকরণ অনুষ্ঠানের শেষদিকে হয়তো থাকবে এক নির্দেশ বৃষ্টির আদেশ। কিন্তু এটি অনুনয় নয়—আদেশ। এই যৌথ আদেশ অনুষ্ঠান সেই যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে যুগের সমাজ ছিল অবিভক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর সমষ্টি-সমাজই যেখানে সর্বপ্রধান-সে সময় মানবসমাজ দুর্বলভাবে হলেও যৌথভাবে বিরূপ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করত।

ধর্মের মতো বিজ্ঞানেরও জন্ম এই ইন্দ্রজাল থেকে। কিন্তু ধর্ম বাড়িয়ে তুলল নেতিবাচক দিকটাই-অজ্ঞাতের সামনে মানুষের অক্ষমতার প্রকাশ হলো ধর্মবিশ্বাস; ঠিক অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞান ইন্দ্রজালের ইতিবাচক দিকটাকেই বিকশিত করল-যা কিছু জানা গেছে তার উপর মানুষের ক্ষমতার প্রকাশ হলো বিজ্ঞানে। মানুষের চিন্তাধারায় অবশ্য দীর্ঘদিন ধরে এই দুই ধারণা অভিন্নভাবেই ছিল। আদি বিজ্ঞানীরা ছিলেন সবাই ধর্মযাজক তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ঐন্দ্রজালিক চিন্তাধারাতেই আচ্ছন্ন ছিল, তাঁদের পূর্বগামীরা অর্থাৎ আদি ধর্মযাজকরা ইন্দ্রজালের উপর তাদের দখলের জোরেই বিশেষ করে বর্ষা সৃষ্টির ইন্দ্রজালের জোরেই, তাদের ক্ষমতা বজায় রাখত। বর্ষা সৃষ্টিকারী হিসাবেই পুরোহিতের হাতে সমস্ত অধিবাসীর মঙ্গলের দায়িত্ব থাকত, অধিবাসীরা সবাই তাকে পূজা করত। প্রথম যুগে পুরোহিত এবং ভগবানকে চিন্তা করা হতো অভিন্ন, পরবর্তী যুগে পুরোহিতেরা ভগবানের অবতার বা পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবেই পূজিত হতেন। পুরাণে পুরোহিতদের যে সমস্ত গুণাবলির বর্ণনা ছিল ঈশ্বর সেই সমস্ত গুণাবলির অধিকারী হিসাবে পূজিত হতেন, পুরোহিতের অনুরূপেই ঈশ্বরের পূজা ও বলি ইত্যাদির অনুষ্ঠান হতো। ঠিক যেমন পুরোহিতের কাছে আবেদন করা হতো, নানা উপকরণ, খাদ্য দিয়ে তাদের সম্মান দেখানো হতো, ঠিক সেই ভাবেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা ও বলিদানের ব্যবস্থার শুরু হলো। ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল গোষ্ঠীপতি সম্বন্ধে কল্পনা থেকেই। কিন্তু মানুষের মনে এই ধারণাটা দাঁড়াল উলটোভাবে। গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতার উৎস ছিলেন ঈশ্বর এবং তার কথাই ছিল ঈশ্বরের কথা। এর থেকে যে ধারণার উদ্ভব হলো বাস্তব চিন্তাধারা তাতে আরও প্রভাবিত হলো।

বন্যজীবন থেকে সভ্য-জীবনে উৎক্রান্তির চূড়ান্ত পদক্ষেপ হলো কৃষিবিদ্যার আবিষ্কার, এর ফলেই শিকারীর বা পশুপালকের যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে মানুষের পক্ষে গ্রামে ও শহরে বসবাস গড়ে তোলা সম্ভব হলো। শিকার বা পশুপালনের তুলনায় কৃষিকার্য অনেক বেশি কঠিন কাজ, তার ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাপ্ত হলো। প্রথম যুগে এ কাজটা প্রধানত ছিল মেয়েদের। পুরুষেরা শিকার ও পশুপালনের কাজ করত এবং মেয়েরা

জমি চাষের কাজ করত। জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উপলক্ষে যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হতো সেগুলো ছিল মানুষের বংশবৃদ্ধির অর্থাৎ নবজাতকের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের অনুকৃতি। অর্থনৈতিক জীবনে স্ত্রী জাতির স্থান অনুসারেই সমাজে তাদের স্থান নির্ণয় হতো। স্ত্রী-প্রধানেরা সমাজকে শাসন করত, তাদের যৌন-জীবনকে দেখা হতো ঐন্দ্রজালিক আচার-অনুষ্ঠান হিসাবে। পৃথিবী যাতে শস্যশালিনী হয় তার জন্যই যেন রানী অর্থাৎ স্ত্রী-প্রধান গর্ভধারণ করতেন। পুরুষ-প্রধান ছিল যেন নারীর গর্ভধারণের মাধ্যম মাত্র।

এর থেকেই আমরা পাই নিকট প্রাচ্যদেশের পৌরাণিক মাতৃপ্রধান ধর্মতন্ত্রের বিশেষ পদ্ধতির পরিচয়। যেমন কোনো দেবীর পূজায় তার মূর্তির সঙ্গে কোনো অপ্রধান পুরুষদেবতার মূর্তি পুত্র বা স্বামী হিসাবে বর্তমান থাকত এবং সে পূজার ক্রিয়াকলাপে প্রজননের ইন্দ্রজালের অনুকৃতিই থাকত প্রধান। কালক্রমে অবশ্য স্ত্রী জাতিরই প্রাধান্য কমে এলো, তার কারণ যুদ্ধবিগ্রহ ক্রমেই বেড়ে গেল এবং এগুলো প্রধানত ছিল পুরুষের কাজ যার ফলে পুরুষদের হাতেই ধনসম্পত্তি সব জমা হতে থাকল। এইভাবে ধর্মজগতেও পুরুষ দেবতার প্রাধান্য বাড়ল এবং দেবী পূজা পিছনে পড়ে গেল। ধারা-বাহিকভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করলে এটা দেখানো সম্ভব যে খ্রিয় ধর্মমত এবং তার অনুষ্ঠানের মূলেও রয়েছে আদিম ইন্দ্রজাল। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে, যেমন খ্রিষ্টমতে ধর্মীয় দীক্ষাদানের (ব্যাপ্টিজম্) ব্যাপার। পূর্বকালীন চিন্তায় সমস্ত পরিবর্তনকেই দেখা হতো মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম হিসাবে। জন্ম এবং মৃত্যুকে দেখা হতো পরিবর্তনের এবং শাশ্বত ধারার দ্বৈত অবিচ্ছেদ্য প্রকাশ হিসাবে। কোনো শিশুর জন্ম হলে বলা হতো তার কোনো মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা পুনর্জন্ম নিচ্ছে। শিশু যখন যৌবন অবস্থা পেত তখন যেন তার শিশু-জীবনের মৃত্যু হতো এবং সে পুরুষ বা নারী হিসাবে পুনর্জন্ম নিত। বয়স্কলোকের মৃত্যু হলে পূর্বপুরুষের আত্মা হিসাবে তার নবজন্ম হতো এবং কালক্রমে সে কোনো নবজাতক শিশুর কলেবরে পুনর্জন্ম নেবার জন্য অপেক্ষা করত। আদিম মানুষেরা এইভাবে অমরতায় বিশ্বাস করত। কিন্তু এই মৃত্যুহীনতা খ্রিষ্টমতে ব্যক্তিগত অমরতা ছিল না। তাদের এই ধারণা কোনো বিশেষ প্রজাতির ধারাবাহিকতার বৈজ্ঞানিক ধারণা থেকে খুব পৃথক ছিল না।

এই সমস্ত পরিবর্তনের জন্যই যেন ইন্দ্রজালের সাহায্যের প্রয়োজন হতো যেহেতু কোনো শিশুর জন্ম মানে ছিল অন্য একজনের মৃত্যু এবং মৃত্যুর সময়কার অনুষ্ঠানাদি মূলত, ছিল এক। ঠিক তেমনি যখন কোনো শিশু যৌবন অবস্থা পেত তখন তাকে এই ধারণার জন্ম হয়েছিল গোষ্ঠীপতি সম্বন্ধে কল্পনা থেকেই। কিন্তু মানুষের মনে এই ধারণাটা দাঁড়াল উলটোভাবে। গোষ্ঠীপতিদের ক্ষমতার উৎস ছিলেন ঈশ্বর, এবং তার কথাই ছিল ঈশ্বরের কথা। এর থেকে যে ধারণার উদ্ভব হলো বাস্তব চিন্তাধারা তাতে আরও প্রভাবিত হলো।

জন্ম, যৌবন ও মৃত্যু এই সর্বসাধারণ ঘটনা ছাড়া কালেভদ্রে আরও কিছু কিছু ঘটনা মানুষের জীবনে ঘটত এবং তার জন্যেও একই ধরনের ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হতো।

ভিনদেশি লোকেদের নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত করে দলের সংখ্যা বৃদ্ধির রীতি ছিল সাধারণ এবং এই উপলক্ষে ধর্মান্তরের বা দত্তক গ্রহণের যে অনুষ্ঠান হতো তা দীক্ষাদানের সময়কার অনুরূপ অনুষ্ঠান। ভিনদেশি হিসাবে তার তখন মৃত্যু হতো এবং এই গোষ্ঠীর লোক হিসাবে সে পুনর্জন্ম নিত। অনুরূপভাবেই যখন কারও রোগ হতো তখন তার রোগমুক্তির জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠান হতো তাতে এই ভান করা হতো যেন নতুন মানুষ হিসাবে সে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে। অপরাধকে মনে করা হতো রোগ হিসাবে এবং রোগকে মনে করা হতো মৃত্যু হিসাবে, কাজেই প্রায়শ্চিত্তকে মনে করা হতো পুনর্জন্ম হিসাবে নতুন জন্ম হিসাবে।

আদিম সমাজে দীক্ষা অনুষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য ছিল নব যুবককে শরীর-মন ও সামাজিক দিক দিয়ে পূর্ণ সদস্য হিসাবে গড়ে তোলা। পূর্ণবয়স্কের জীবনের বাস্তব দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়াই ছিল এই অনুষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য। দীক্ষা কথাটার অনুরূপ শব্দ, গ্রিক ভাষায় যা ডিমিটার বা ডিওনিসাসের উপকথায় পাওয়া যায়, তার অর্থ হচ্ছে, সুষ্ঠুভাবে ‘পরিণত বয়স্ক হওয়া। খ্রিষ্টীয় দীক্ষাদান প্রথম যুগে হতো কেবল বয়স্কদেরই এবং তা ছিল পুনর্জন্মের অনুরূপ আচার অনুষ্ঠান; হে পরমকারণিক পিতা, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার দৈবশক্তিতে এই শিশুকে পুনর্জীবিত করিতেছেন, আপনি ইহাকে আপনার নিজের পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন এবং আপনার পবিত্র খ্রিষ্টান ধর্মমণ্ডলীর অংশভুক্ত করিয়া লইতেছেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে ইহাকে আপনি এই অধিকার দিন যে, তাহার পাপ-জীবনের অবসান হোক এবং সে পবিত্রতার পুনর্জীবন লাভ করুক, খ্রিষ্টের সমাধি ও পুনর্জীবনের সে অংশীদার হোক এবং অবশেষে সে যেন পবিত্র খ্রিষ্টান ধর্মমণ্ডলীর অংশ হিসাবে আপনার অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হয়।

এর থেকে দেখা যায় যে, অন্যান্য ধর্মের মতো খ্রিষ্টধর্মেও আদিম দীক্ষাদান পদ্ধতি পুরোপুরি গ্রহণ করা হয়েছে এবং তাতে নতুন উপাদান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আদিম দীক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব জগতে পূর্ণবয়স্ককে দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে তোলা; খ্রিষ্টীয় দীক্ষাদানের লক্ষ্য হচ্ছে দীক্ষাগ্রহণকারীকে এ পৃথিবীর জন্য নয় পরলোকের জন্য প্রস্তুত করা, জীবদ্দশার জন্য নয়, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করা। শ্রেণিসংগ্রাম যাদের প্রধানত পদানত ও নিপীড়িতে পরিণত করেছে, এই পৃথিবীর সুখ-স্বাচ্ছন্দে জন্মগত অধিকার যাদের লুণ্ঠন করা হয়েছে তাদের আর্ত ও ভারাক্রান্ত জীবনের সব আকাঙ্ক্ষা এই বাস্তব দুনিয়া থেকে সরিয়ে এক কাল্পনিক পরজগতে হারানো অধিকার ফিরে পাবার ব্যর্থ আশার দিকে ঘোরানো হয়েছে। জন্মগত অধিকারকে মৃত্যুপরবর্তী অধিকারে পরিণত করা হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সম্মুখসংগ্রামে মানুষের দুর্বলতা যেমন রূপায়িত হয়েছে ইন্দ্রজালে, তেমনি সমাজের সঙ্গে মুখোমুখি সংগ্রামে মানুষের দুর্বলতা রূপ পেয়েছে ধর্মে।

আদি খ্রিষ্টধর্মের যুগ

রোম সাম্রাজ্যের অধীনে গ্রিসের এবং নিকট প্রাচ্যের (প. এশিয়া) পুরানো দাসরাজ্যগুলো আর তার সঙ্গে গল ও স্পেনের কম অগ্রসর গোষ্ঠীগুলো একটি সম্রাট-শাসিত রাষ্ট্রে সংহত হয়েছিল এবং তার ফলে দাস-অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ সমস্ত স্ববিরোধিতাই এখানে প্রবল হয়ে উঠল। গরু-গাধার মতোই একজন ক্রীতদাসও ছিল তার প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি, তার না থাকত কোনো সামাজিক অধিকার না কোনো মানবিক অধিকার। সে ছিল যেন ‘জীবন্ত যন্ত্র’, তার তৈরি সমস্ত বাড়তি মালই তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হতো। উৎপাদনের তখন যা স্তর ছিল তাতে করে মুক্ত শ্রমিকের চেয়ে ক্রীতদাসের শ্রমই ছিল অধিক লাভজনক কিন্তু সাধারণভাবে বলা চলে যে, দাস-শ্রমিকের পক্ষে উৎপাদন বাড়াবার বা তার কৌশল উন্নত করার কোনো প্রেরণা থাকত না। তার ফল হলো যতদিন পর্যন্ত দাস শ্রম সস্তা ছিল ততদিন নতুন কোনো আবিষ্কারের বিশেষ কোনো সুযোগ ঘটেনি, কারণ একদিকে যেমন তার প্রয়োজন ছিল না, তেমনি অন্যদিকে একমাত্র

বিশ্রামভোগী প্রভুরা ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতায় অনভিজ্ঞ। পরবর্তীকালে যখন দাস-শ্রমপ্রথায় লাভের অঙ্ক ফুরিয়ে এলো তখন তার পরিবর্তে নতুন কোনো শ্রমপ্রথা চালু করা কঠিন হয়ে উঠল, কারণ দাস-শ্রমপ্রথা এমন অমানুষিক হয়ে উঠেছিল যে, এর ফলে কায়িক পরিশ্রম করাটাই একটা ঘৃণ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এইভাবেই একালের প্রথম শতাব্দীগুলিতেই রোম সাম্রাজ্য এমন একটা যুগে প্রবেশ করেছিল যখন অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার আস্তে আস্তে ভাঙন শুরু হয়ে যায় এবং সাংস্কৃতিক ও আত্মিক দিক দিয়েও রোম সাম্রাজ্য ক্ষয়ে আসে।

অধীনস্থ জাতিগুলির মধ্যে অনেকে ছিল যারা সবে আদিম সাম্যাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে মাত্র।

রোম সাম্রাজ্যের অনুগৃহীতদের কবলে পড়েনি—খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর একজন লেখক এমন একটি স্পেনীয় জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে লিখেছিলেন :

'তারা প্রতি বছরই জমি পুনর্বণ্টন করে নেয় এবং উৎপন্ন ফলমূল যা ছিল সাধারণ সম্পত্তি—প্রত্যেকে তার ভাগ পায়। আত্মসাৎ করা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় ছিল।'

ঐ লেখকই স্পেনীয় রৌপ্যখনিগুলোর অবস্থা সম্পর্কে আমাদের কিছুটা আলোকপাত করেছেন :

'খনি কর্মীরা যারা তাদের প্রভুদের জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণে লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে তুলত - তারা নিজেরা জীবন কাটাত মাটির নিচে—রাত-দিন খেটে নিজেদের শরীর ক্ষয় করে ফেলত। অনেকের জীবনই শেষ হয়ে যেত এমনি ছিল তাদের দুর্ভোগ। পরিশ্রমের হাত থেকে তাদের ছুটিও মিলত না—বিশ্রামও মিলত না। তার উপর তদারককারীদের চাবুকের নিচে এমনি দুঃসহ ক্লেশে ভুগতে তারা বাধ্য হতো যে, তার ফলে একমাত্র দৈহিক শক্তি ও মানসিক বলের জোরে যে কয়জন দীর্ঘ জীবন এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারত তারা ছাড়া অন্য সকলের জীবনের অবসান ঘটত কারণ মৃত্যুই তাদের কাছে ছিল ঐ অবস্থায় ভয়।'

তাদের জন্মগত অধিকার থেকে সদ্য বঞ্চিত এই মানুষেরা তাই সেন্ট পল-এর নিম্নলিখিত কথাগুলোয় অতি শীঘ্রই সাড়া দিল :

'দেহের জন্য তোমরা যদি বাঁচতে চাও তাহলে তোমাদের মৃত্যু হবে, কিন্তু যদি আত্মার জোরে দেহকে আয়ত্ত করতে পার, তাহলেই তোমরা বাঁচবে। পরমাত্মা নিজেই আমাদের কাছে সাক্ষী যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং সন্তান বলেই আমরা তার উত্তরাধিকারী-খ্রিষ্টের সঙ্গে একত্রে উত্তরাধিকারী এবং এই যদি হয় তাহলে হোক না তাঁরই সঙ্গে একত্রে দুঃখভোগ আমাদের, তাতে তাঁরই সঙ্গে একই গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত হয়ে উঠব। আমরা জানি যে আজ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিটাই একই সঙ্গে দুঃখভোগ করছে—যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে।'

দাস-শেমিকের শোষণ করে যে মুনাফা হতো তা আর পুনরায় উৎপাদনের কাজে লাগানো হতো না কারণ দাস-প্রথার উপর ভিত্তি করেই উৎপাদন চলত বলেই উৎপাদন বাড়াবার কোনো উপায় ছিল না। কাজেই এই মুনাফা শুধু ব্যয়ই করা হতো।

শাসকশ্রেণি এক ঘৃণ্য বিলাসী ও অমিতব্যয়িতার জীবনযাপন করত, পক্ষান্তরে রোমের সাধারণ জনতা চির-ভিক্ষুকের জীবনযাপন করত। ক্রীতদাসেরা কোনো বিপ্লবী শেণিতে পরিণত হলো না, তারা তা হতেও পারত না, কারণ উৎপাদনের বিকাশে তারা কোনো উচ্চতর স্তরের প্রতিনিধিত্ব করত না। মাঝে মাঝে তারা বিদ্রোহ করত, ক্ষেপে উঠত—সেগুলো হতো তাদের ব্যক্তিগত মুক্তির জন্য, বিপ্লবের পথে সমাজের পরিবর্তনের জন্য নয়। আর তাদের সে সব বিগ্রোহ বর্বরভাবে দমিয়ে দেওয়া হতো। যে শক্তি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাল তা তাদের থেকে আসেনি।

সে শক্তি এসেছিল দূর দূর সীমান্তের দেশগুলো থেকে। এই সীমান্ত দেশগুলোর বিরুদ্ধে রোমান শাসকেরা ক্রমাগত যে যুদ্ধবিগ্রহ চালাত তার ফলেই রোমান সভ্যতার আওতার মধ্যে তারা এসে পড়ত। এইভাবেই রোমান রীতি-পদ্ধতি, শিল্প-কৌশলের শিক্ষা তারা পেল, যুদ্ধকৌশলও তারা শিখল। তার ফলে তারা দেখতে পেল যে বাইরে থেকে ক্ষমতা ও ধনসম্পদের যতই জাঁকজমক থাক না কেন, রোমান সাম্রাজ্য ভেতর থেকে ঘুণধরা হয়ে গেছে। এরপর ধীরে ধীরে শক্তির ভারসাম্য বদল হতে থাকল। সীমান্তের অসভ্য জাতিগুলো যখন প্রতি-আক্রমণ শুরু করল শোষিত দেশবাসীরা তখন দু-হাত বাড়িয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল।

সাম্রাজ্য যখন এইভাবে ভেঙে পড়তে থাকল, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের সমস্ত শ্রেণিই, শোষক-শোষিত নির্বিশেষে এক হতাশার চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল, তাদের যেন মনে হলো সারা দুনিয়াটাই এক প্রলয়ের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। পুরাতনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে নতুন জগতের অঙ্কুর জন্ম নিচ্ছিল তা তাদের নজরে পড়েনি। এই অবস্থা ঐন্দ্রজালিক ধর্মবিশ্বাস, ধর্মোন্মত্ততা এবং নানা ধরনের অজ্ঞতাবাদ বিস্তারের অপূর্ব সুযোগ করে দিল। অন্যান্য ধর্মমতের অন্যতম হিসাবেই খ্রিষ্টধর্মের শুরু হলো। অরফিজম, মিথাই, ম্যানিজেইশম, আতিস ও আইসিস-এর ইন্দ্রজাল এই সমস্তই একই ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছিল, তা হচ্ছে বর্তমান জীবন সম্বন্ধে হতাশা এবং এক কাল্পনিক পরলোকে মুক্তির আশা।

প্রথম যারা ক্রিষ্ট মত গ্রহণ করে তারা ছিল প্রধানত গরিব স্বাধীন মানুষ, দাসত্বমুক্ত মানুষ এবং ক্রীতদাস। যে প্রতীকের দ্বারা (ক্রুশ) তারা তাদের ধর্মবিশ্বাস প্রকাশ করত তার থেকেই এটা বোঝা যায়। ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা ছিল সাধারণভাবে অপরাধী বা ক্রীতদাসদের হত্যা করার পদ্ধতি। কোনও ক্রীতদাসের পক্ষে তার স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারাই প্রতীক লাভ করেছে খ্রিষ্টীয় পরিত্রাণ-প্রথায়। সেই পুরাকালেও খ্রিষ্টীয় ধর্মমত কোনো বিপ্লবী আন্দোলন ছিল না। সেই অবস্থায় তা হওয়া সম্ভবও ছিল না। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম প্রগতিশীল ছিল। সেদিন যে প্রগতিটুকু সম্ভব ছিল, তা হলো, যে বন্ধনে সাম্রাজ্যগ্রন্থিবদ্ধ ছিল সেই বন্ধনের বিলোপ, যে বন্ধনে ক্রীতদাস তার প্রভুর কাছে আবদ্ধ ছিল তার বিলোপ এবং যে-বন্ধন সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের সম্রাটের অনুগত প্রজা করে রেখেছিল সেই বন্ধনের বিলোপ। খ্রিষ্টানেরা দাসপ্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেনি, সিজারের যা প্রাপ্য তা তাকে তারা দিয়েছিল কিন্তু তারা ক্রীতদাস অথবা স্বাধীন মানুষ উভয়কেই এই ধর্ম গ্রহণ করার পথ করে দিয়েছিল এবং তারা সম্রাটকে পূজা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এতে করে তারা সম্রাটের ঐহিক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধেই অনাস্থা ঘোষণা করল। তার ফলে তারা বেআইনি ঘোষিত হলো, তাদের খুঁজে খুঁজে বের করা হতে থাকল, তারা কারারুদ্ধ হলো, নির্যাতন চলতে থাকল তাদের উপর-বন্যপশুর মুখে তাদের ছুঁড়ে দিয়ে রোমে উৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকল; কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ও অদম্য সাহসের সঙ্গে তারা মৃত্যুবরণ করল, ভ্রান্ত বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হলেও সেদিনের সে সব ঘটনা দ্বারাই তাদের বিশ্বাসের ন্যায্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। রোমের দরজায় সেদিন যে অসভ্য জাতিরা এসে হানা দিয়েছিল তাদের হাতেই এই অত্যাচারীদের বিচারের দিন ঘনিয়ে এল।

সাম্রাজ্য ভেঙে পড়লে খ্রিষ্টধর্ম দ্বিতীয় যুগে প্রবেশ করল এবং এই পরিবর্তিত অবস্থায় খ্রিষ্টধর্ম শাসকশেণির হাতিয়ার হয়ে উঠল। এই ধর্মের কিছু কিছু প্রতিদ্বন্দ্বীদের খ্রিষ্টানেরা আত্মসাৎ করে নিল, আর অপরদের তারা নিজেরা পূর্বে যেভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তেমনি নির্মমভাবে ধ্বংস করল। কিন্তু এই নতুন যুগে এই ধর্ম এক সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছিল মনে করলে ভুল করা হবে। পক্ষান্তরে সামন্তবাদের গড়ে ওঠবার যুগে, পূর্বে বা পরের যে কোনো

অবস্থার তুলনায় খ্রিষ্টধর্ম সব থেকে বেশি গঠনমূলক ভূমিকা নিয়েছিল।

ইতালিতে অসভ্য জাতিসমূহের আক্রমণের বহু পূর্বেই, ক্রীতদাসদের দ্বারা ব্যাপক কৃষিপ্রথায় রোমান পদ্ধতির অর্থকরিতা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় জমিদারী ভেঙে খণ্ড খণ্ড করে স্বাধীন কৃষকদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই কৃষকেরা জমিতেই লেগে থাকত এবং বিশেষ ধরনের নির্দিষ্ট খাজনা বা পণ্যে রাজস্ব দিতে বাধ্য থাকত। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে রোমান ভাবধারা কম প্রবেশ করেছিল সেখানে এই অসভ্য বিজেতারা জমিতে অল্পজমির মালিকানাভোগী চাষিদের এনে বসিয়েছিল। সেই চাষিরা অবশ্য ছিল জমির বন্ধনে বন্দি ভূমিদাস; কিন্তু ক্রীতদাসদের সঙ্গে এদের পার্থক্য ছিল, এরা তাদের উদ্বৃত্ত ফসলের কিছুটা মাত্র ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকত, এবং তাদের যেমন বাধ্যবাধকতা ছিল তেমনি তাদের অধিকারও ছিল। সবথেকে নিচের ইউনিট (সংস্থা) ছিল গ্রাম্য সমাজ বা ম্যানর। একজন ভূমি অধিকারী থাকত তার শাসক এবং তারা ক্ষমতা পেত শেষ পর্যন্ত গোষ্ঠীপতিদের কাছ থেকে। গিল্ডের মধ্যে সংগঠিত কারিগরেরা কুটিরশিল্প পরিচালনা করত। ক্রীতদাস যেহেতু পাওয়া যেত না শ্রেমিকের সংখ্যা সেইজন্য কম পড়ত এবং তার ফলে কর্মদক্ষতার দাম বেড়ে গেল। পরিশ্রম বাঁচাবার নানারকম যন্ত্র চালু হলো-শ্রোতে চালানো চাকার যন্ত্র, বায়ুচালিত কল, ঘোড়ার সাজ, হাল প্রভৃতি; এইভাবে উৎপাদনের কৌশল এমনি একটা স্তরে তোলা হলো যাতে করে দাসশ্রম প্রথা আর লাভজনক রইল না। এই সমস্ত কৌশলের বিকাশ খ্রিষ্টানেরা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছিল। খ্রিষ্টানেরা প্রথা হিসাবে দাস-প্রথার বিরোধী ছিল এমন নয়, কিন্তু প্রধান ধর্মযাজক ও পুরোহিতেরা নিজেরাই ছিল বড় বড় সামন্ত প্রভু এবং তার জন্যই তারা কর্মে নিযুক্ত কৃষকদের ও কারিগরদের চূড়ান্তভাবে শোষণ করতে উৎসাহী ছিল। তাছাড়া পৌত্তলিকদের ধর্মান্তরিত করে তারা অসংখ্য স্থানীয় ও গোষ্ঠীতন্ত্রের পার্থক্য ভেঙে দিয়েছিল, তার ফলে বর্তমান ইউরোপীয় জাতিসমূহের উদ্ভবের পথ তারা খুলে দিয়েছিল। সমাজের একমাত্র শিক্ষিত অংশ হিসাবে তারা অতীতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বহু পরিমাণে উত্তরাধিকারী রোমান আইনকানুন, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ করেছিল এবং পরবর্তী যুগে বহন করে এনেছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন

পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হতে হতে কালক্রমে শ্রমশক্তিও যখন পণ্যে পরিণত হলো সেই সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের মধ্য থেকে ধনতন্ত্রের উদ্ভব হলো। বেতনভোগী শ্রমিক ক্রীতদাসদের মতো অন্যের অস্থাবর সম্পত্তি নয় কিংবা জমির বন্ধনে বন্দি ভূমিদাসও নয়—দৃশ্যত সে মুক্ত। ভূমিদাসরা অবশ্য আংশিকভাবে হলেও তার উৎপাদনের উপকরণের মালিক। বেতনভোগী শ্রমিক তার নিজের কর্মক্ষমতা-তার শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য কিছুরই মালিক নয়। এই শ্রমশক্তিই সেই ধনিকের কাছে বিক্রি করে। বাঁচার জন্যই তাকে এই শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয়, কাজেই প্রকৃতপক্ষে সে মুক্ত নয়।

মধ্যযুগের খ্রিষ্টীয় ধর্মতন্ত্র সামন্তসমাজকে ঐশী আশীর্বাণী জানিয়েছিল। কৃষকদের তাঁবে রাখার জন্য এবং শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতি রোধের জন্য এইসব বাণী ব্যবহার করা হয়েছিল। নিছক মুনাফার জন্যই মুনাফা অর্জন পাপের কাজ বলে নিন্দনীয় হয়েছিল। গ্রেসিয়ান, যিনি সংহিতা আকারে ধর্মের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করেছিলেন, বলেছেন : 'যে ব্যক্তি নিছক বিক্রি

করে লাভ করার জন্য কোনো জিনিস খরিদ করে, সে হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত ক্রেতা ও বিক্রেতাদেরই একজন।' গ্রেসিয়ানের মতে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি জিনিসটাই অন্যায়। তিনি বলেছিলেন : এই জগতে ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসই সাধারণের সম্পত্তি হওয়া উচিত।' এরকম যে হয়নি তার কারণ মানুষের দুর্বলতা। মানুষ ভগবৎ মহিমা থেকে অধঃপতিত হয়েছে। মানুষের অধঃপতন ও তার প্রথম পাপ সম্পর্কে যে উপাখ্যান প্রচলিত আছে তা হচ্ছে ধর্মকথার খোলসে শেণিসংগ্রামের সূত্রপাত সম্পর্কে লোককাহিনী।

যাই হোক না কেন, শিল্প-বাণিজ্যের অগ্রগতির শক্তি পোপের নির্দেশ বা গির্জার নিন্দাবাণী থেকে অনেক বেশি জোরালো প্রমাণিত হলো। ধর্মযাজকদের কর্তৃত্ব ব্যবসায়ীদের উন্নতির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ানোর ফলে ব্যবসায়ীরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন উদ্যোগের দাবি জোরদার করে তোলার জন্য ধর্মের ক্ষেত্রেও বিবেকের স্বাধীনতার দাবি তুলল এবং ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের নষ্টামি, ভণ্ডামি বিলাসপ্রিয়তার নিন্দা ঘোষণা করল। এই ব্যাপারে কৃষকদের সমর্থনও তারা পেল। এইভাবে ইউরোপ এক ধর্ম-বিদ্রোহের যুগে প্রবেশ করল। এই বিদ্রোহের কোনোটি হয়তো ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং অন্যগুলো সুসংগঠিত এবং তার সবগুলোরই ধরন ছিল প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের মত ও পথের বিরুদ্ধে অন্য মত প্রচার করা। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব সাধারণত আসত বুর্জোয়াশেণী থেকে, কৃষকরা থাকত এদের গণভিত্তি; এবং সময়ে সময়ে এই আন্দোলনের বাম অংশে কিছু কিছু কল্পনাবিলাসী চরমপন্থীর আবির্ভাব ঘটত যারা ছিল ভবিষ্যতের সর্বহারাশেণীর পূর্বাভাস।

১৩৩৬ সালে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট পোপকে সেলামি দিতে অস্বীকার করল; এই সেলামির পরিমাণ নাকি ছিল রাজাকে দেয় খাজনার চতুর্গুণ। কয়েক বছর পর জন ওয়াইক্লিফ নামে অক্সফোর্ডের একজন অধ্যাপক প্রচার করতে থাকেন যে, মানুষের বিবেকের আসল বিচারক হচ্ছেন ঈশ্বর—পোপ নন এবং ধর্মযাজকদের উপর সাধারণ আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। গির্জা কর্তৃপক্ষ তার উপর অত্যাচার চালালেও তিনি সাধারণ কৃষক ও অল্প বিত্তশালীদের সমর্থন পেলেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনে তিনি ছিলেন মধ্যপন্থি। গণতন্ত্রপন্থি ছিল কারিগর এবং শহরের শ্রমিকেরা এবং তাদের প্রতিনিধি ছিল ললার্ডরা। 'গরিব ভ্রাতৃসঙ্ঘ' নামে সংগঠিত হয়ে দেশে দেশে ঘুরে পুরোহিতদের দেয় ট্যাক্স ও মাথাপিছু কর রদের দাবি তারা প্রচার করত এবং তাদের ঘোষণা ছিল যে: 'ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত জিনিসই সাধারণের সম্পত্তি হওয়া উচিত।' তাদের এই প্রচারের পরিণতি ঘটল ১৩৮১ সালের কৃষক বিদ্রোহে। রাজা ও ধর্মযাজকেরা এই বিদ্রোহে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা এই বিদ্রোহ দমিয়ে দিল। বিদ্রোহ প্রবলভাবে চলতে থাকাকালে রাজারা যে প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল তা ভঙ্গ করে রাজা দেশের অভ্যন্তরে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করল এবং পলাতক বিদ্রোহীদের যেখানেই পেল সেখানেই তাদের হত্যা করতে থাকল। গ্রামবাসীরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানালে তারা এই কড়া জবাব পেল : 'তোমরা সব দাস এবং দাসই চিরকাল থাকবে।'

ওয়াইক্লিফের অভিমত ছিল যে, সাধারণ মানুষের নিজেদের ধর্মপুস্তক পড়বার অধিকার থাকা উচিত। ইংরেজি ভাষাতে যারা বাইবেল তর্জমা করেছেন তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে প্রথম। এই তর্জমাই হচ্ছে তর্জমাকারীদের ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি অনুরক্তির চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ। এদের সম্পর্কে; কডওয়েল ঠিকই বলেছেন যে : 'কবিতার উপযুক্ত সহজ ও স্বচ্ছ বাস্তব ভঙ্গিতে ইংরেজি গদ্য প্রথম লেখেন ধর্মবিদ্রোহীরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাদের কাছে এটা ছিল একটা ধর্মের কাজ কিন্তু এটা বিপ্লবী কাজও ছিল। তুচ্ছ অলঙ্কার ও প্রচলিত রীতি পদ্ধতি ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ

করে সরলতা ও নিরলঙ্কারতার দাবি এতে প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র সত্য ছাড়া অন্য কিছু প্রকাশের ইচ্ছা এতে ছিল না।'

একপুরুষ ধরে জন হাস নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (যিনি ওয়াইক্লিফের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন) বোহেমিয়াতে পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করেন। তাকে ধর্মচ্যুত করা হয় এবং খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারা হয়। তার এই মৃত্যু জার্মানদের বিরুদ্ধে চেকজাতির জাতীয় বিদ্রোহের নিশানা হয়ে দাঁড়াল। জার্মানরাই তখন দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করত এবং ধর্মযাজকদের মধ্যে প্রধান প্রধান স্থান ছিল জার্মানদের দখলে। বিদ্রোহীদের মধ্যে একদিকে ছিল বড় বুর্জোয়া ও অভিজাত সম্প্রদায়-তাদের কেন্দ্র ছিল প্রাগে এবং তাদের মতলব ছিল গির্জার অধীনে ভূসম্পত্তি ও খনিগুলো দখল করা। অন্যদিকে ছিল কৃষক সম্প্রদায় ও তাদের সঙ্গে ছোট ছোট শহরের পেটিবুর্জোয়া ও শ্রমিকেরা। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব অতি শীঘ্রই গণতন্ত্রীদের হাতে এসে পড়ল, এই গণতন্ত্রীদের বলা হতো ট্যাবরাইট।

ট্যাবর নামীয় এক খনি শহরে তারা তাদের সাম্যবাদী পল্লী গড়ে তুলেছিল; এবং সারা ইউরোপের ধর্মদ্রোহীদের জড়ো করে এমন শক্ত সংগঠন তারা সেখানে খাড়া করেছিল যার জোরে একপুরুষ ধরে শত্রুদের সমস্ত আক্রমণ তারা প্রতিরোধ করতে পেরেছিল। শুধু জার্মান ক্যাথলিকরা নয়, ধর্মসংস্কার আন্দোলন যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিপদ হয়ে দেখা দিল সেই সময়ে চেক অভিজাত সম্প্রদায় ও বড় বুর্জোয়ারাও বিদ্রোহের শত্রু হয়ে দাঁড়াল। ট্যাবরাইটদের সাম্যবাদ ছিল দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে সাম্যবাদ-উৎপাদন সম্পর্কে নয়; সেই সময়কার অপরিণত উৎপাদন শক্তিসমূহের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তার বৃহত্তম প্রকাশ ছিল এটা। পরে দেখা গেল যে উৎপাদকের উপকরণসমূহ যদি সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত না করা যায় তাহলে জীবনধারণের উপকরণে সমতা সৃষ্টি সম্ভব নয়। ধনতন্ত্র বিকাশের গতিরোধের উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহ ছিল দুঃসাহসী কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

অন্য জায়গার তুলনায় এই জার্মানিতে বিদ্রোহ হয়েছিল দীর্ঘতর ও বেশি ভয়ঙ্কর। বিদ্রোহের প্রধান দুজন নেতা ছিলেন—মার্টিন লুথার যিনি ছিলেন বুর্জোয়া ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিম্নস্তরের প্রতিনিধি এবং টমাস মুয়েজার—যিনি ছিলেন কৃষকদের ও জনসাধারণের প্রতিনিধি। প্রথমে লুথার ছিলেন মৌলিক পরিবর্তনপন্থি (র‍্যাডিকেল)। তিনি যাজক সম্প্রদায়ের রাজপুরুষ ও জমিদারদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন : 'এ বিদ্রোহ তোমাদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ নয়, এ হচ্ছে তোমাদের অপকর্মের জন্য শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের নিজের ইচ্ছার প্রকাশ।' কৃষকরা তার এই কথা অনুযায়ীই তাকে বিশ্বাস করেছিল। সমস্ত জার্মানি জুড়ে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকদের নেতারা এমন সব দাবি তুলতে আরম্ভ করল যাতে করে পোপের মনে যে ধরনের ক্রোধ জেগে উঠতে থাকল অনুরূপ ক্রোধই মার্টিন লুথারের মনেও সৃষ্টি হতে থাকল। লুথার তখন তার মিত্রদের ত্যাগ করে এসে শাসনকর্তাদের অনুরোধ জানালেন বিদ্রোহীদের বন্দি করতে এবং 'ক্ষেপা কুকুরের মতো তাদের পিষে মারতে।'

টমাস মুয়েন্‌জার ছিলেন এনব্যাপটিস্টদের সঙ্গে যুক্ত একজন অভিজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ। তিনি বোহেমিয়াতেও গিয়েছিলেন এবং সেখানে হাসাইট আন্দোলনের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্রের অভ্রান্ততা সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর মত ছিল যে, ঈশ্বরের রাজত্ব এই মরজগতেই সৃষ্টি করতে হবে, স্বর্গে নয় এবং ঈশ্বরের রাজত্বের ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন এইভাবে যে তার ভিত্তি হবে এমন যেখানে সব সম্পত্তি হবে সাধারণের এবং সমাজে পুরো সাম্য বজায় থাকবে। তিনি খুব ভালো সংগঠক ছিলেন এবং শুরু থেকেই

তিনি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন লুথার কিভাবে তার বিরোধিতা করেছিলেন এবং মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিন বছর ধরে আন্দোলন করার পর তিনি কীভাবে গ্রেপ্তার হন, নির্যাতিত হন এবং কীভাবে মাথা কেটে ফেলে তাকে হত্যা করা হয় সে সব কাহিনি এঙ্গেলসের 'জার্মানিতে কৃষক-যুদ্ধ' নামীয় বইতে বর্ণিত হয়েছে। এইসব থেকে দেখা যায় সাম্যবাদের ধারণা যে শ্রেণিসমাজের বৃদ্ধির ফলে সেই সময়ে বিধ্বস্ত হয়েছিল তা চার্চের অভ্যন্তরেও কীভাবে বেঁচে ছিল।

টমাস মুয়েন্‌জারের আদর্শ সেদিন সফল হয়নি এবং বস্তুত তখন তা সফল হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু সেই আদর্শের ফলে যে কৃষক বিগ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল তা না হলে জার্মান বুর্জোয়াদের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া সেদিন সম্ভব হতো না।

ইংল্যান্ডের বিপ্লব

ইতিমধ্যে ইংল্যান্ডের ধনতান্ত্রিক সম্পর্কের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভূমিদাস-প্রথা বহুদিন আগেই নির্বাসিত হয়ে গিয়েছিল। পণ্যে সেলামি দেওয়ার রীতি খাজনাপ্রথায় পরিবর্তিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে বহু কৃষকের জমি ঘিরে নিয়ে তাদের জমি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল এবং তাদের জমিগুলো পশম ব্যবসায়ের জন্য পশুচারণ ভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল। এই সব জমিচ্যুত চাষিরা শিল্পপতিদের সস্তা মজুরে পরিণত হয়েছিল। শতাব্দীর শুরুতে অন্যতম প্রধান সামন্ত পরিবার-টিউডর পরিবার বুর্জোয়াদের সহযোগিতায় এক একচ্ছত্র কেন্দ্রীয় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো, পোপকে অগ্রাহ্য করার মতো শক্তি এই রাজতন্ত্র অর্জন করে। নবগঠিত জাতীয় গির্জার প্রধান হিসাবে অষ্টম হেনরি রোমের প্রতি (পোপের প্রতি) তার আনুগত্য পরিত্যাগ করলেন, খ্রিষ্টীয় মঠগুলি তিনি উঠিয়ে দিলেন এবং গির্জার অধীনস্থ সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে হয় রাজার অধিকারে রাখলেন, নয় বুর্জোয়াদের কাছে বিক্রি করে দিলেন। ইংল্যান্ডের ধর্মসংস্কার আন্দোলন এইভাবে সেখানে ধনতন্ত্র বিকাশের পথে এক উল্লেখযোগ্য ধাপ অধিকার করেছিল। কিন্তু টিউডাররা বুর্জোয়াদের সমর্থন পেলেও তারা শাসনকার্য চালাতো সামন্ত নৃপতি হিসাবেই। বুর্জোয়াশ্রেণি শাসক শক্তি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে তখনও সক্ষম হয়নি।

প্রথম জেমসের সময়ে ভুমি—রাজস্ব কমে আসায় এবং ক্রমশ ব্যয় বৃদ্ধি হতে থাকায় রাজশক্তিকে ক্রমেই কর বৃদ্ধির পথ গ্রহণ করতে হচ্ছিল এবং এই কর বৃদ্ধির চাপ প্রধানত পড়ত বুর্জোয়াদের উপরেই। পার্লামেন্টের মারফতে বুর্জোয়ারা তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের এই প্রস্তাব ভোটে নাকচ করে দিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য রাজকীয় একচেটিয়া অধিকার ও অন্যবিধ সামন্ততান্ত্রিক হস্তক্ষেপের অবসান দাবি করল। প্রথম চার্লস-এর সময়ে, এই বিরোধিতার সম্মুখীন হবার জন্য রাজশক্তি তার পুরানো শত্রুদের কাছে অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের ভূস্বামীদের অবশিষ্টাংশের কাছে সাহায্য চাইল; এই ভূস্বামীদের পশ্চিম এবং উত্তর প্রদেশে কিছু শক্তি তখনও ছিল। এই সংঘর্ষই পরে গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়। ধর্মের নামে এই যুদ্ধ হয়েছিল। ইংল্যান্ডের গিজভাসারা-যার যাজকরা ছিলেন রাজারই মনোনীত, তারা প্রেসবিটারিয়ান্স, স্বতন্ত্র এবং সেক্টারিস নামীয় অন্য কতকগুলো যাজক গোষ্ঠীর সম্মুখীন হলেন; এরা ধর্মীয় পূজা অর্চনায় গণতান্ত্রিক সংস্কার দাবি করলেন। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু ছিল বুর্জোয়াদের তরফে ক্ষমতা অর্জন করা। প্রথম জেমস্‌

এটা বুঝলেন, তখন তিনি বললেন, 'ধর্মযাজকরা না থাকলে রাজাও থাকবে না।' পরিণতিতে রাজতন্ত্রের অবসান হলো এবং চার্চও পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে এল।

প্রজাতন্ত্রীরা যারা রাউন্ড হেডস্ নামে অভিহিত হতেন তারা শক্তি সংগ্রহ করলেন বুর্জোয়া ভদ্রশ্রেণি রায়ত কৃষক, শহরের শ্রমিক ও কারিগরের এক যৌথ মোর্চা থেকে; এরা সবাই অত্যাচারী প্রথম চার্লস-এর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু জয়লাভের পর তাদের এই মৈত্রী ভেঙে গেল। বড় বুর্জোয়ারা চাইছিল সমস্ত সামন্তযুগীয় বাধা থেকে মুক্তি, ধনতান্ত্রিক প্রথায় সম্পত্তি বৃদ্ধির স্বাধীনতা, অন্য কথায় কিসান ও মজদুরদের আরও ব্যাপক ও প্রচণ্ডভাবে শোষণ করার স্বাধীনতা। এদের অভিহিত করা হতো গ্রান্ডি নামে এবং এদের নেতা ছিলেন ক্রমওয়েল। অপরপক্ষে লেভেলাররা দাবি করেছিলেন ব্যাপক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যে গণতন্ত্রে সমস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত লোকদের পর্যন্ত ভোটাধিকার দেওয়া হবে। এদের মধ্যে যারা বেশি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান না করা হলে প্রকৃত গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয়। ডিগাররা ছিলেন এদের মধ্যে, তারা সারে-তে একটি সাম্যবাদী পল্লী স্থাপন করেছিলেন।

উভয়পক্ষই তাদের দাবি-দাওয়া প্রচার করেছিলেন ধর্মীয় ভাষায়, কিন্তু ডিগাররা অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ধর্মবিশ্বাসকে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হচ্ছে গরিবদের ধোঁকা দিয়ে এই কথা মানিয়ে নিতে যে, তাদের গরিবানা ঈশ্বরের ইচ্ছারই প্রকাশ। ডিগারদের নেতা উইনস্ট্যানলি যা বলেছেন তা হচ্ছে এই: "এই যে ধর্মীয় নীতি বাণী যাকে তোমরা বল 'আত্মিক' ও স্বর্গীয় বস্তু, আসলে তা হচ্ছে চোর ডাকাতের পদ্ধতি যা নিয়ে মনুষ্যজীবনের শান্তির দ্রাক্ষাক্ষেত্র লণ্ডভণ্ড করা হয় এবং সদর দরজা দিয়ে যা আসে না, আসে ঘোরা পথ দিয়ে। এই সব মর্মবাণী আসলে হচ্ছে জুয়াচুরি, কারণ সাধারণ মানুষেরা যখন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পরে স্বর্গের স্বপ্ন অথবা নরকের আতঙ্কে মগ্ন থাকে, সেই সুযোগে তাদের চোখের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়—যাতে করে তারা তাদের জন্মগত অধিকারগুলো দেখতে না পায় এবং জীবনকালে এই পৃথিবীতে তাদের করণীয় কি তা তারা দেখতে না পারে। এই সব নোংরা স্বপ্নালুতা, এসবই হচ্ছে এমন মেঘ যার বৃষ্টি হয় না। এই সব ছদ্মবেশী ধর্মযাজকেরা জানে যে এরা যদি এদের ঐশ্বরিক বাণীর মোহে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে মৃত্যুর পরপারে স্বর্গের ঐশ্বর্য ও গৌরবের চিন্তায় বিভোর রাখতে পারে, তা হলে এই পৃথিবীর সব কিছুরই অধিকারী হতে পারবে ধর্মযাজকেরা নিজেরা এবং মোহগ্রস্ত মানুষদের তারা তাদের গোলামে পরিণত করতে পারবে।"

এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায় যে, যে সমস্ত মেহনতি মানুষ ডিগারস আন্দোলনে জমা হয়েছিলেন তারা শ্রেণি-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ডিগারসরা পরাজিত হয়েছিলেন এবং অনতিকাল পরে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল। কিন্তু ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে আবার যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো তা পূর্বাবস্থার পুনরাবৃত্তি থেকে অনেক পৃথক ছিল। বিদ্রোহের ফলে যে সমস্ত দীর্ঘস্থায়ী লাভ হয়েছিল তারই অনেকটা সংহত চেহারা ছিল এই নতুন রাজতন্ত্র। পুরানো সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়েছিল। বুর্জোয়ারাই এখন ক্ষমতা পেল। দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের মতানুযায়ীই রাজত্ব চালাতেন। একথা সত্য যে, দ্বিতীয় জেমস্ আর একবার স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন; ফলে তিনি নিজেই রাজ্যচ্যুত হয়েছিলেন এবং রাজমুকুট পরানো হয়েছিল একজন ওলন্দাজকে, যিনি পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব মেনে নিতে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

যা হোক যে হাজার হাজার লেভেলাররা, হয় কারারুদ্ধ হয়েছিলেন অথবা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং যারা বিপর্যস্ত অবস্থায় গণতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে ভগ্নহৃদয় এবং হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তাদের পক্ষে এই বছরগুলো তীব্র মোহমুক্তির সময়; এ সবের থেকে আত্মরক্ষার জন্য অনেকে আবার ধর্মকর্মে আশ্রয় খুঁজে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে এই সময়কার নমুনা হিসাবে গ্রহণ করা চলে এমনি একজন হলেন—জন বুনিয়ন।

বুনিয়নের রাজনৈতিক মত কি ছিল তা আমরা জানি না, কিন্তু এ কথা আমরা জানি যে ক্রমওয়েলের সৈন্যবাহিনীতে তিনি ছিলেন এবং তিনি সেই ধরনের রায়ত চাষিদের ঘর থেকে এসেছিলেন যাদের মধ্য থেকেই অধিকাংশ লেভেলাররা সংগৃহীত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের কথা প্রথম শোনা যায় নর্মান জমিদার পুলক্সহিলের রায়ত হিসাবে এবং ১৫৪৮ খ্রিষ্টাব্দে যখন প্রথম ঘেরাওয়ের ফলে জনসাধারণের জমি হাতছাড়া হতে শুরু হয়েছিল সেই সময়ে একজন টমাস বুনিয়ন তিন রুড জমি বিক্রি করেছিলেন বলে দেখা যায়। এর পর থেকে এই পরিবারের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে থাকে এবং বুনিয়নের নিজের কথাতেই বলা যায় যে, এই পরিবার সমাজে এমনি স্তরে নেমেছিলেন—যে স্তর ছিল দেশের মধ্যে সব থেকে নিচু এবং সব থেকে ঘৃণিত।'

তাঁর যৌবনে এবং প্রথম বয়সে এক প্রলোভনের দ্বারা তিনি পীড়িত হতেন, তা ছিল 'ক্রিষ্টকে বেচে দেওয়ার' প্রলোভন :

'সেই প্রলোভন আমার মধ্যে আবার জেগে উঠল এবং এবারে আরও প্রচণ্ড এবং ভয়ঙ্কর লোভ জাগিয়ে তুলল সে। সে লোভ হচ্ছে পবিত্র খ্রিষ্টকে বিকিয়ে দেওয়া, তাঁকে পরিত্যাগ করা এবং তাঁর পরিবর্তে এই জীবন রক্ষার জন্য যা হোক কিছু সংগ্রহ করা... অবশ্য আমার বিবেকের বিচারে আমি জানতাম যে, একবার যে সত্যি সত্যি খ্রিষ্টকে গ্রহণ করেছে, তাঁর দয়ায় একবার যে তাকে পেয়েছে, সে চিরদিনের জন্য কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারে না; তাঁর দয়ায় আমি নিজেকে যেভাবে দেখেছি, খাতে তাঁকে আমিও চিরতরে ছাড়তে পারি না। ঈশ্বর নিজেই বলেছে, 'জমি কখনও একেবারে বেচা যায় না কারণ সমস্ত জমিই আমার', তা সত্ত্বেও ক্রমাগতই যিশুর বিরুদ্ধে একটা চিন্তায় আমি বিব্রত বোধ করতাম যে, যিশু আমাকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছেন...কোনো কোনো সময়ে এই চিন্তা শত শত বার ভিড় করে আসত; তাকে বিকিয়ে দাও, তাকে বিকিয়ে দাও।

'ইসাও এর জন্মগত অধিকার বিকিয়ে দেওয়ার ধর্মকাহিনি সারাদিন ধরে, সারা সপ্তাহ ধরে, এমনকি সারা বছর ধরে আমার মনের উপর চেপে বসে থাকত; সমস্ত মনকে আমার দমিয়ে রাখত, আমি আমার মনকে এই চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতাম না বা ধর্মগ্রন্থের অন্য উপাখ্যানে আমি মনোযোগ দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কথাটা আমার মনের মধ্যে বাজতে থাকত 'তোমরা শোন, কেমন করে যখন ঐশী আশিস সে পেতে পারত তখন অনেক চোখের জলে চেষ্টা করেও সে অনুশোচনার কোনো জায়গা পেল না'।... এখানে জন্মগত অধিকার অর্থ হচ্ছে পুনর্জন্ম আর ঐশী আশিস হচ্ছে চিরন্তন উত্তরাধিকার।'

এই আত্মিক দ্বন্দ্বের মূল ছিল অবশ্য এই যে বুনিয়ন সত্যি সত্যি বহুবার তাঁর নিজের বিশ্বাস ছেড়ে দিয়ে ক্যাথলিক চার্চের মত মেনে নেবার প্রলোভনে পড়তেন। কিন্তু এই চিন্তা তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তা; আরও বেশি কিছু ছিল। শুধু একজন ব্যক্তির নয়, একটা গোটা শ্রেণির কণ্ঠস্বর ফুটে বেরিয়েছে এর মধ্যে দিয়ে; যে ইংরেজ কৃষকরা পুরুষানুক্রমে কল্পনায় নয়, বাস্তবে তাদের জন্মগত অধিকার বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়ে আসছিল, এই ধরণীর সব সম্পদের উপর তাদের

অধিকার, শস্যের প্রাচুর্য আর পানীয়ের অধিকার বিকিয়ে দিতে বাধ্য হয়ে আসছিল-এ ছিল তাদেরই আর্তনাদ।

অবশেষে বুনিয়ন শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখলেন ঈশ্বরের দক্ষিণে যিশু দাঁড়িয়ে আছেন এবং এই দৈববাণী তার কানে এসে বাজল 'তোমার সাধুতার পুরস্কার পাবে স্বর্গে।' তার মনের দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে গেল। আর কোনো শয়তানী লোভ এসে তাকে পীড়া দিতে পারেনি। তার সব আকাঙ্ক্ষা স্বর্গলাভে নিহিত হয়েছিল, অবশ্য এই অবস্থাতেও তিনি অত্যাচারীদের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি তার আত্মিক স্বাধীনতা তিনি বজায় রেখেছিলেন। তার লেখা *পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস* পুরুষানুক্রমে ইংরেজ কৃষক-মজুরদের প্রেরণার উৎস হয়েছিল। যখন শিল্প বিপ্লব এক নয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিস্ফোরণ ঘনিয়ে আনল তখন এই কিসান মজুরদের বিপ্লবী বীর্য এবার নতুন করে ফেটে পড়ল।

এ যুগের সর্বহারাশ্রেণি

শিল্প-পুঁজিবাদের ব্যাপ্তির ফলে সস্তা মজুরের এক অপূরণীয় চাহিদা দেখা দিল, যার ফলে কয়লাখনিতে, সুতাকলে হাজার হাজার এমন কিষান পরিবার এসে জড়ো হলো যারা জবর-দখলের ফলে জমিচ্যুত হয়েছিল; এই সব শিল্পাঞ্চলে বড় বড় কেন্দ্রে একত্রে কাজ করার ফলে তারা প্রথমে ধীরে ধীরে এবং বহু দুঃখের মধ্যে আন্দোলনে একতার কথা শিখল। নিজেদের একটি পৃথক শ্রেণি হিসাবে বুঝতে তারা সচেতন হলো; তাছাড়া ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ফলে তারা তাদের অবস্থা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে এক নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল, এই ফরাসি বিপ্লবই ইতিহাসে সর্বপ্রথম মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নামে প্রকাশ্য নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বিপ্লবই, ইউরোপীয় বুর্জোয়াশ্রেণির এই তৃতীয় মহাবিদ্রোহেই, ধর্মের নামাবলি পরিত্যক্ত হলো এবং সর্বপ্রথম স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বস্তুজগতের ভাষায় বিপ্লবের উদ্দেশ্য ঘোষিত হলো।

অধিকাংশ ইংরেজ কারখানা-শ্রমিকের কাছে ইংল্যান্ডের গির্জার ভদ্রসুলভ ধর্মবাণীর কোনো আকর্ষণ ছিল না। তারা সবাই মেথডিস্ট গির্জায় গিয়ে ভিড় করত, সেখানে তারা সবাই সমানভাবে মিশত এবং 'ঈশ্বর-চিন্তা' নিবেদন করত। এইভাবে তারা হাজারে হাজারে লিখতে, পড়তে এবং বক্তৃতা করতে শিখল। শ্রমিকের কাজকর্মে যত উচ্চতর কৌশলের প্রয়োজন হতে লাগল, ততই শ্রমিকের পক্ষে শিক্ষিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠল। মালিকেরা অবশ্য আশা করত যে, শ্রমিকেরা তাদের লেখাপড়া বাইবেল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখবে, বাইবেলের বাণীই তারা প্রচার করবে, কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই শ্রমিকেরা অনেকেই টম্ পেইন, কর্বেট ও অন্যান্য প্রগতিপন্থির লেখা পুস্তিকা পড়তে ও তাদের ভাবধারা আলোচনা করতে শুরু করল। আজকের দিনে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে ভয়ার্ত উন্মত্ততার সঙ্গে কুৎসা প্রচার করা হয়, অনুরূপভাবেই এই প্রগতিবাদীদের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্রী' বলে কুৎসা প্রচার করা হতো।

এসব সত্ত্বেও মেথডিজম এবং অন্যান্য নন-কনফর্মিস্ট আন্দোলন (প্রচলিত চার্চের বিরোধী খ্রিষ্টান আন্দোলন) শ্রমিকশ্রেণির রাজনৈতিক চেতনার গতিরোধই করেছিল। ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য যা জার্মান, ফরাসি বা ইউরোপীয় অন্যান্য দেশে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, তা হচ্ছে এখানকার আন্দোলনে ধর্মের জোরালো প্রভাব। ব্রিটিশ

লেবার পার্টির সাধারণ সভ্যদের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে কাল্পনিক ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রবল প্রভাব দেখা যায় এই জন্যই, যার ফলে সঙ্কটের সময় তারা খেই হারিয়ে ফেলে এবং বিশ্বাসঘাতক নেতাদের প্রতি আনুগত্যের ভুল চিন্তাধারায় তারা অচল হয়ে পড়ে।

১৮৩২ সালে বুর্জোয়াদের মধ্যে নয়া শিল্পপতিগোষ্ঠী নির্বাচন-পদ্ধতির পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়, যাতে করে সর্বপ্রথম দেশের মধ্যে তাদের শক্তি অনুযায়ী পার্লামেন্টে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার অর্জনের সম্ভাবনা তারা সৃষ্টি করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত শ্রমিক জনতার ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। এরপর চার্টিস্ট আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণি, যারা তখন বিশ্বের নেতৃত্ব করছিল, সে আন্দোলনে তারা শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রকাশ্য ঘোষণা প্রচার করে নিজেদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে সংগঠিত করছিল। তাদের প্রচার ছিল—'রাষ্ট্রক্ষমতা দখল আমাদের পন্থা, সামাজিক সুখবিধান করা আমাদের লক্ষ্য।' এই আন্দোলন দমিত হয়ে যায়। ধর্মযাজক, মন্ত্রী এবং পাদ্রিদের ঐকান্তিক সাহায্যে সরকার শ্রমিকদের সম্মেলনগুলো ভেঙে দেয়, তাদের নেতাদের গ্রেপ্তার করে এবং কারখানার অমানুষিক গোলামির জীবনে আবার তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মাত্র ভোটাধিকার অর্জনের জন্যই তাদের আরও ৪০ বছর অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

১৮৪৭-এর শেষে, যখন এই আন্দোলন শেষ হয়ে এসেছিল সেই সময়ে কমিউনিস্ট লীগ নামে শ্রমিকদের এক আন্তর্জাতিক সংস্থা গোপনে ইংল্যান্ডে সমবেত হন এবং তাঁরা তরুণ মার্কস ও এঙ্গেলসকে একটি কর্মসূচি প্রণয়নের ভার দেন, সেই কর্মসূচিই পরের বছরে *কমিউনিস্ট ইশতাহার* নামে প্রকাশিত হয়। তাতে তাঁরা লেখেন 'সমাজের বিপ্লব সৃষ্টি করে এমনি সব ভাবধারার কথা মানুষ যখন বলে তখন তাতে এই ঘটনাই প্রকাশ হয় যে, পুরানো সমাজের অভ্যন্তরে নতুন সমাজের উপাদান সৃষ্টি হয়েছে, পুরানো জীবনযাত্রার অবসানের তালে তালে পুরানো ভাবধারার অবসান অগ্রসর হয়।

'আদিম দুনিয়া (গ্রিক ও রোমান) যখন তার শেষ অবস্থায় পৌঁছেছিল তখন আদিম ধর্মব্যবস্থাকে পরাজিত করে খ্রিষ্টধর্মের উদ্ভব হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের কাছে যখন খ্রিষ্ট মতবাদ পরাজিত হয় সেই সময়টাতে তদানীন্তন বিপ্লবী বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামন্ত সমাজ মৃত্যুসংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ধর্মের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার ভাবধারা ছিল জ্ঞানের রাজ্যে স্বাধীন প্রতিযোগিতার প্রভাবের প্রকাশ।...

'অতীতের সমস্ত সমাজের ইতিহাস হচ্ছে শ্রেণি-বিরোধের বিকাশের ইতিহাস, বিভিন্ন যুগে বিরোধের যে বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছিল তার ইতিহাস। কিন্তু যে কোনো রূপেই এই বিরোধ প্রকাশ পেয়ে থাক না কেন, একটা ঘটনা সমস্ত যুগের বর্তমান ছিল তা হচ্ছে-সমাজের এক অংশের উপর আর এক অংশের শোষণ। তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, যত বিভিন্ন ধরনেই তার প্রকাশ হয়ে থাক না কেন অতীতের যুগগুলোর সামাজিক চেতনা কয়েকটি সাধারণ কাঠামো বা ভাবধারার মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে এবং যতদিন না পর্যন্ত শ্রেণিবিরোধের অবসান হয় ততদিন সেই বিভিন্ন ধারাগুলো লুপ্ত হয়ে যেতে পারে না।

'অতীতের প্রচলিত সম্পত্তি সম্পর্কের সঙ্গে সব থেকে চূড়ান্ত সংঘর্ষের প্রকাশ হয় সাম্যবাদী বিপ্লবে, কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, এই বিপ্লবের বিকাশের ভিতরে অতীতে ভাবধারার সঙ্গেও চূড়ান্ত সংঘর্ষ অন্তর্নিহিত রয়েছে।'

বুর্জোয়ারা আমাদের সভ্যতার শত্রু বলে নিন্দা করে থাকে। এই নিন্দা করতে গিয়ে তারা নিজেরা শ্রেণি হিসাবে যে স্বার্থ ভোগ করে তার সঙ্গে সভ্যতাকে পরোক্ষে এক করে দেখতে

চায়। আমরা কোনো বিশেষ সুযোগের শত্রু ঠিকই, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে শ্রেণি-শোষণের অবসান না করলে সভ্যতার অগ্রগতি হতে পারে না, এমনকি সভ্যতা বজায় রাখাও যায় না। বুর্জোয়ারা আমাদের ধর্মের শত্রু বলে নিন্দা করে।

আমরা সেই পরিমাণে ধর্মের শত্রু ঠিকই, যে পরিমাণে বুর্জোয়ারা জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য ধর্মকে ব্যবহার করে; এবং আমরা বিশ্বাস করি যে, শ্রেণিসংগ্রামের অবসান হলে মানুষ ধর্মের প্রয়োজন কাটিয়ে উঠবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ইতিমধ্যেই মানুষ তা করেছে, কিন্তু আমরা ধর্মের পূজা-অর্চনার স্বাধীনতা সব সময়েই সমর্থন করি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে মার্কসবাদ একদিকে যেমন দাসপ্রথা, সামন্তবাদ ও বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির সমস্ত ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরোধী অন্যদিকে তেমনি যারা সামাজিক ন্যায়াধিকার দাবি করার সাহস প্রকাশের জন্য নির্যাতন সহ্য করেছিলেন সেই প্রথম যুগের খ্রিষ্টানদের, টেবরাইটদের, ললার্ডদের, অ্যানাব্যাপটিস্টদের এবং অন্যান্য ধর্মাদ্রোহী বা ধর্মের বিপরীত মতাবলম্বীদের শিক্ষার মধ্যে যা কিছু মহৎ সে সমস্তই মার্কসবাদের মধ্যে গ্রহীত হয়েছে। মার্কসবাদ তাদের সমস্ত আশা ও আদর্শকে গ্রহণ করেছে, এবং এই পৃথিবীতে সেই আশা ও আদর্শকে সম্পূর্ণ সচেতন, রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক লক্ষ্য হিসাবে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করেছে। যে কোন খাঁটি খ্রিষ্টানের মতো ন্যায়, সত্য ও সৎ জীবনে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। কিন্তু আমাদের মতে এগুলো কিছু স্বর্গীয় শাশ্বত সত্য বস্তু নয়, যা এই বাস্তব জগৎ ত্যাগ করে পরপারে খোঁজ করতে বলা হয়ে থাকে, বরং এগুলো হচ্ছে বহু কষ্টার্জিত সম্পদ যা মানুষ প্রকৃতি ও সমাজকে বশে আনবার জন্য যে অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে তার মধ্য দিয়ে নিজে সঞ্চয় করেছে এবং আরও বৃদ্ধি, আরও সমৃদ্ধ করে চলেছে। আমরা একথা বিশ্বাস করি না যে, মানুষ এক কল্পিত সর্বশক্তিমান ঐশীশক্তির কাছে মাথা ঠুকে তার ভাগ্যের উন্নতি বিধান করতে পারে, বরং মানুষের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ নিজেই। যে পর্যন্ত না সে তার অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে সে পর্যন্ত সে অবস্থার দাস এবং ততদিন সে শুধু মুক্তির স্বপ্ন দেখতে পারে। অবস্থা সম্পর্কে যতই সে জ্ঞান অর্জন করে ততই সে অবস্থাকে বশ করতে সক্ষম হয় এবং মুক্তি অর্জন করতে পারে। বাস্তব দুনিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তি আসতে পারে না বরং দুনিয়াকে বুঝে ও জয় করে মুক্তি আসতে পারে। মার্কসবাদ বস্তুর উপর মনের নির্ভরতা স্বীকার করে, কিন্তু এও ঘোষণা করে, যে বস্তুকে বশে আনবার ক্ষমতা মনুষ্যমনের আছে, মার্কসবাদই একমাত্র বিশ্বাস-পদ্ধতি যাতে ব্যক্তিত্বের বাধাবন্ধনহীন সীমাহীন ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। মনুষ্য প্রকৃতিতে আমাদের আস্থা অসীম : 'আদম, তোমাকে আমি কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান, বিশেষ আকৃতি বা বিশেষ কর্তব্য নির্দিষ্ট করে দিইনি—যাতে তুমি স্বাধীনভাবে যে কোনও বাসস্থান, আকৃতি বা কাজ বেছে নিতে পার। বিশ্বের মধ্যে তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি যাতে তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সহজেই দেখতে পার; আমি তোমাকে স্বর্গেরও নয় মর্ত্যেরও নয়, মরও নয় অমরও নয়, এমনিভাবেই গঠন করছি, যাতে করে ভাস্করের মতো খুশিমাফিক নিজেকে তুমি গঠন করতে পার। পশুর স্তরে নামবার কিংবা দেবতার স্তরে উঠবার পূর্ণ অধিকার তোমার রইল।'

রেনেশাঁস আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি পিকো ডেলা মিরান্ডোলা উপরের কথাগুলো লিখেছিলেন। বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী শ্রেণী ছিল সেই সময়কার বুদ্ধিজীবীদের এই ছিল সাধারণ ভাবধারা। কিন্তু আজ তারা এসব পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু এই ভাবধারা নতুন জীবন পেয়েছে-নয়া রেনেশাঁস আন্দোলনে মার্কসবাদই নয়া মানবতাবাদ। এই নয়া মানবতাবাদ হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক মানবতাবাদ যার মধ্যে বুর্জোয়া মানবতাবাদের সব সম্পদ এবং শ্রেণি-সংগ্রামের অবসানের ফলে

ও তৎসাধিত মানবসমাজের মুক্তির ফলে যে নতুন সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে সে সবই সঞ্চিত হয়েছে।

কমিউনিস্ট নীতিবোধ

লেনিন বলেছিলেন—'আমাদের নীতিবোধ সর্বহারাশ্রেণির শ্রেণিসংগ্রাম থেকে উদ্ভূত হয়।' বুর্জোয়া নীতিবাগীশেরা এই কথায় ক্ষেপে যান। তারা বলেন, এ হচ্ছে নৈতিক মূল্যবোধকেই অস্বীকার করা; এবং যেহেতু কমিউনিস্টরা নৈতিক মূল্যবোধকেই অগ্রাহ্য করেন সেইহেতু তারা দুর্নীতিপরায়ণ।

নৈতিক মূল্যবোধকে আমরা অগ্রাহ্য করি না, কিন্তু আমরা একথাও স্বীকার করি না যে, এই মূল্যবোধ শাশ্বত কিছু। সামাজিক বিবর্তন থেকে নৈতিক মূল্যবোধের উৎপত্তি। ঠিক যেমন মানবসমাজ বর্বরতার মধ্য দিয়ে সভ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে, পশু জীবনের মধ্যে থেকে। ঠিক তেমনি করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা মানুষের মনে যুগে যুগে সামাজিক বিকাশের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে গঠিত ও ক্রমবিকশিত হয়েছে।

আমরা কি একথা বলতে পারি না যে, সততা, সৎব্যবহার, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণগুলো সমাজের সমস্ত যুগেই সমর্থনীয় এবং তাই সেইগুলো শাশ্বত? হ্যাঁ, তা আমরা বলতে পারি, কিন্তু তাতে করে আমাদের কিছু এগোবে না। যে সামাজিক জীবন থেকে এই গুণগুলোর উদ্ভব হয়েছে, সেই সমাজ-জীবন থেকে বাদ দিয়ে দেখলে এগুলো শুধু কয়েকটি অর্থহীন অবাস্তব ধারণা হয়ে দাঁড়ায়, যে মুহূর্তে বাস্তব জীবনে এসব আমরা পরীক্ষা করে দেখি তখনই তার মধ্যে নানা উল্লেখযোগ্য অন্তর্বিরোধ প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্যের শ্রমফলের উপর জীবনধারণ করা কি সততার পরিচয়? ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা কাকে বলে? অপরাধ সহ্য করা কি আমাদের উচিত? তা হলে অপরাধ বলতে কি বোঝায়? ইহুদি বিদ্বেষ কি অপরাধ? কমিউনিজম কি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র? সর্বহারাশ্রেণির পক্ষে ক্ষমতা দখলের পর যে সমস্ত ধ্বংসকারী বা প্ররোচনা সৃষ্টিকারী ধনতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন করতে চায় তাদের উচ্ছেদ করা কি ন্যায়সঙ্গত? এর প্রত্যেকটি প্রশ্নই শ্রেণিস্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিতে ছাড়া এগুলোর বিচার করা সম্ভব নয়। শ্রেণিসমাজের প্রত্যেক যুগেই শাসকশ্রেণি বিশেষ ধরনের নৈতিক বিধি সৃষ্টি করেছে, যাতে করে তার বিশেষ স্বার্থ রক্ষিত ও স্থায়ী হয় এবং তার জন্য এই বিধিগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে শাশ্বত বা অব্যয় বলে অভিহিত করতে চেয়েছে।

পৌরাণিক সমাজে নৈতিক বিধি নির্ধারিত হয়েছিল এই ধারণা অনুযায়ী যে, স্বাধীন মানবদের থেকে ক্রীতদাসেরা স্বাভাবিকভাবেই হীন। কিন্তু এই বিধি ততদিন শাশ্বত ছিল যতদিন পর্যন্ত পৌরাণিক সমাজ ছিল। অবশ্য যেখানে গোলামি রয়ে গিয়েছে সেখানে এই স্বাভাবিক হীনতার ধারণা আজও টিকে আছে এবং আজও বুর্জোয়া ভাবধারায় উপনিবেশের জনসাধারণকে শোষণ করবার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য এই ধারণা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে এবং বস্তুত উপনিবেশের জনসাধারণের অবস্থা সামান্য পরিমাণেই মাত্র উন্নত হয়েছে। সামন্ত সমাজের নৈতিক বিধি নির্ধারিত হয়েছিল এই ধারণা অনুযায়ী যে, ভূমিদাসেরা যদিও রাজন্যবর্গের মতো একই ঈশ্বরের সন্তান, তবু তারা ঈশ্বরের দ্বারাই এই পৃথিবীতে হীন বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। সামন্ত সমাজের এই বিধির অবসান করে তার স্থান দখল করে ধনতান্ত্রিক সমাজবিধি, যার ভিত্তি হলো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বুর্জোয়া ভাবধারা-যাতে করে ধনিকদের শ্রমিকশ্রেণির সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করবার

স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হলো। বুর্জোয়ারা অস্বীকার করতে পারে না যে, পৌরাণিক এবং সামন্তযুগীয় সমাজবিধি চূর্ণ করা হয়েছে, কিন্তু তারা একথা স্বীকার করতে সাহস করে না যে, ধনতান্ত্রিক সমাজবিধিও অবধারিতভাবে চূর্ণ হবে, কারণ তা যদি হয় তাহলে বুর্জোয়ারা যে শ্রেণি-শাসন চালাচ্ছে তার নৈতিক ভিত্তি ধসে যায়। পৌরাণিক সমাজের থেকে সামন্ত সমাজের নীতিবোধ উন্নত, তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধও সামন্ত সমাজের নীতিবোধের থেকে উন্নত, কারণ সামাজিক বিবর্তনের প্রতি পরবর্তী ধাপই মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপ্তি ঘটিয়েছে। কিন্তু এদের মধ্যে একটি জিনিসে মিল আছে তা হচ্ছে এই যে শ্রেণি-বিভক্ত সমাজের চিন্তাধারাই এই নীতিবোধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। ঠিক এইভাবেই কমিউনিস্ট নীতিবোধ সেই সমাজের প্রতিফলন যে সমাজে শ্রমিকশ্রেণি রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে; কিন্তু এই অবস্থা হচ্ছে সরাসরি সাম্যবাদে পৌঁছানোর পথে একটি মধ্যবর্তী স্তর এবং সাম্যবাদী সমাজে কোনো শ্রেণিই থাকবে না। সর্বহারাশ্রেণির এইটিই হচ্ছে ঐতিহাসিক নিয়তি, কাজেই তার নীতিবোধের বৈশিষ্ট্য অতীতের যে কোনো যুগের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। এই নীতিবোধের আহ্বান এত স্পষ্ট, এত সঙ্গত এবং এত বেশি শক্তিশালী যে, একমাত্র জঘন্যতম বর্বরতা ও শঠতার সাহায্যেই তার প্রতিরোধ করতে পারে।

যেভাবে ধনতন্ত্র পুরুষানুক্রমে আমাদের জাতির সন্তানদের গাসগো ও লন্ডনের বস্তিগুলিতে রোগ ও পঙ্কিলতার মধ্যে রেখে দণ্ড দিচ্ছে তা কি বর্বরতা নয়? তারপর জামেইকা, ডারবান, সিঙ্গাপুর অথবা অন্য সব শহরে যেখানে সেইসব 'অনগ্রসর' মানুষেরা বাস করে যাদের সভ্যজীবনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমরা নিয়েছি, সেইসব জায়গার সঙ্গে তুলনা করলে গাসগো লন্ডনের ঐ নোংরা বস্তিগুলোকেও মনে হবে স্বর্গ। যে সমাজব্যবস্থা পতিতাবৃত্তি ও অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয়, পারিবারিক সম্পর্কে অধঃপতন ও অপবিত্রতার সৃষ্টি করে, সেই সমাজের পক্ষে পারিবারিক সততা ও নারীর গৌরবের কথা প্রচার করা কি ভণ্ডামি নয়? এমনি দুঃসহ অবস্থার মধ্যে যারা সংগ্রাম করছে তাদের কাছে এই ভান করা কি প্রতারণা নয় যে, যে শ্রেণি এই দুরবস্থা তৈরি করছে, এই অবস্থা চলতে দিচ্ছে এবং এর থেকে মুনাফা লুটছে তাদের উৎখাত না করে এ অবস্থা পরিবর্তনের অন্য পথ আছে? এই সমস্ত কোটি কোটি দুর্গত মানুষের মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার থেকে মানবজীবনে অন্য আর কি মহত্তর কাজ আছে?

এইসব বিবেচনার ভিত্তিতেই আমাদের কমিউনিস্ট নীতিবোধ ও বুর্জোয়া নীতিবোধের পার্থক্য বিশেষণ করতে হবে। আবার লেনিনের কথায় বলছি—'লোকে যখন আমাদের কাছে নীতিবোধের কথা বলে, তখন আমরা তাদের বলি, কমিউনিস্ট মতে নীতিবোধ হচ্ছে সংহত, ঐক্যবদ্ধ শৃঙ্খলা এবং শোষকশ্রেণির বিরুদ্ধে সচেতন গণ-আন্দোলন। শাশ্বত নীতিবোধ বলে কোনো জিনিসে আমরা বিশ্বাস করি না এবং এই নীতিবোধ সম্পর্কে যতসব আজগুবি কথা প্রচলিত আছে আমরা সে সবের মুখোস খুলে দিই। নীতিবোধের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবসমাজকে উন্নততর স্তরে উঠতে সাহায্য করা এবং শ্রমিকশ্রেণির উপর শোষণের অবসান করা।

'পুরানো সমাজের ভিত্তি ছিল এই নীতির উপর, লুঠ কর অথবা লুণ্ঠিত হও, অন্যের হয়ে কাজ কর অথবা অন্যকে তোমার হয়ে কাজ করতে বাধ্য কর, হয় গোলামের মালিক হও অথবা নিজে গোলাম হও'। কাজেই এই ধরনের সমাজের লালিত মানুষ, বলতে গেলে, তার মায়ের দুধের সঙ্গেই এই চিন্তাধারা, এই অভ্যাস, এই মনোভাবের উত্তরাধিকারী হয় যে, 'হয় গোলামের মালিক অথবা গোলাম, অথবা ছোট মালিক, অথবা ছোট চাকুরে, ছোট কর্মচারী অথবা একজন বুদ্ধিজীবী—এক কথায় এমন মানুষ হও যে শুধু নিজের চিন্তা নিয়েই থাকে এবং অন্যের জন্য এক

কানাকড়ির চিন্তাও করে না’। এই জমির মালিক আমি-অন্যের জন্য আমি একটুও চিন্তা করি না। অন্যে যদি উপোস করে—তাহলে তো ভালোই, আমার নিজের ফসলের জন্য আমি আরও বেশি জমি পেতে পারি; ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক অথবা কেরানির চাকরি আমার আছে—অন্যের জন্য একটুও পরোয়া করি না আমি। আজ যদি আমি আমার উপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারি তাহলে হয়তো কোনও দিন আমি বুর্জোয়াদের সমান স্তরে উঠতেই পারি। একজন কমিউনিস্টের এই ধরনের মনস্তত্ত্ব বা মনোভাব কখনও থাকতে পারে না।...

‘শ্রমিক ও কৃষকদের উপর জমিদার ও ধনিকদের অত্যাচারকে ভিত্তি করেই পুরানো সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই অত্যাচার আমাদের ধ্বংস করতে হবে, এই অত্যাচারী ব্যবস্থা আমাদের উচ্ছেদ করতে হবে, এই কাজ করতে হলে আমাদের চাই একতা। কলকারখানা এবং বহু যুগব্যাপী ঘুম থেকে জেগে ওঠা কলকারখানার শিক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারাই এই একতা গড়ে ওঠা সম্ভব; এই শ্রেণির জন্ম হবার ফলেই এমন আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল যার পরিণতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি—দুনিয়ার অন্যতম দুর্বল দেশে সর্বহারা বিপ্লব সার্থক হয়েছে এবং সেই দেশ দীর্ঘ তিনবছরব্যাপী সারা দুনিয়ার বুর্জোয়াদের আক্রমণকে প্রতিহত করেছে; আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সারা দুনিয়া জুড়ে সর্বহারা বিপ্লব এগিয়ে চলেছে; আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বলতে পারি যে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণিই এমন সংহত শক্তির সৃষ্টি করতে পেরেছে যা বিচ্ছিন্ন ও একতাহীন কৃষক জনতার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে এবং শোষণ-রাষ্ট্রের সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে। একমাত্র এই শ্রেণিই মেহনতি জনতাকে সংহত হতে সম্মিলিত হতে, সমস্ত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে সম্পূর্ণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

‘এই জন্যই আমরা বলি যে আমাদের চোখে মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নীতিবোধ নেই। সে ধরনের নীতিবোধ আসলে হচ্ছে জুয়াচুরি। আমাদের মতে সর্বহারাশ্রেণির শ্রেণিসংগ্রামের স্বার্থ সমস্ত নীতিবোধের উপরে স্থান পায়।’

১৯২০ সালে তরুণ রুশ শ্রমিকদের কাছে প্রথম সর্বহারা বিপ্লবের নেতা এই যে জ্বলন্ত কথাগুলো বলেছিলেন, তার সঙ্গে আমি তুলনা করছি এক শতাব্দীকাল আগে আমাদের দেশের একজন বিপ্লবী কবি ইংরেজ শ্রমিকদের কাছে যে ভাষায় আবেদন জানিয়েছিলেন সেই কবিতার :

স্বাধীনতা,—কি তাহা?
তুমি জান মজ্জায় মজ্জায়
দাসত্বের পরিচয়,
তোমার জীবনের
পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে তার জাল।
তোমাকে খাটতে হয় অবিশ্রান্ত
কয়েক কপর্দক মজুরির বিনিময়ে,
তাই দিয়েই তোমার দেহের বল রাখে জীইয়ে
আবার যাতে ওরা নিঙড়ে নিতে পারে শোষণের পেষণ যন্ত্রে।
ওদের হয়ে তাঁত-ঘরে কিংবা খামারে,
সৈন্যের পরিখায় বা যুদ্ধক্ষেত্রে,
স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক
ওদের রসদ যোগাও তুমি,

ওদের বাঁচিয়ে রাখ তোমার আপন জীবনের বিনিময়ে।
স্বর্ণপিণ্ডের প্রেতাত্মারা সব
তোমার মেহনতের রক্ত শুষে নেয় লক্ষ মুখ দিয়ে,
অতীতে স্বপ্নেও দেখেনি কোনও শয়তানে
এমনি মুনাফার অঙ্ক তোলে ওরা ফাঁপিয়ে।
এই পৃথিবীর মাটিতে তোমার আজন্ম অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে
ওরা তোমাকে দিয়েছে কাগজের নকল দলিল।
তোমার বিবেককেও গোলাম বানাতে চায় ওরা,
তোমাতে তোমার কিছু রাখতে চায় না ওরা,
ওদের মর্জিমতো গড়ে পিটে ওরা তৈরি করে তোমাকে।
স্বাধীনতা, কি তোমার সংজ্ঞা?
একবার যদি জীবন্ত কবরের মধ্য থেকে
পরাধীন মানুষেরা ঘোষণা করতে পারত তোমার দাবি।
দুঃস্বপ্নের ইন্দ্রজালের মতো সব টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে পড়ত
অত্যাচারী সব জারিজুরি।
স্বাধীনতা
ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে ক্ষুধার অন্ন,
কর্মক্লান্ত শ্রমিকের চোখে তুমি
দিনান্তে এক শান্তির সুখনীড়ে কল্পছবি।
ভুখা, নাঙ্গা, অবমানিত জনতার কাছে
তুমি অশন, বসন, আর আশ্রমের সার্থক প্রতিশ্রুতি।
দেশের প্রান্তে প্রান্তে আজ যে বুভুক্ষার জ্বালা
কোন স্বাধীন দেশে তা রইতে পারে না।
দুর্বলের কণ্ঠরোধ করে যে দর্পিত বলীর হস্ত,
তুমি তাকে প্রতিহত করো।
তোমার স্পর্শে জীবন্ত হয়ে ওঠে পীড়িত মানুষের দল,
পদদলিত সর্পের মতো জেগে ওঠে অত্যাচারিত দুর্বলেরা,
ন্যায়ের বাণী উচ্চারিত হয় তোমার কণ্ঠে,
তোমাকে তাই স্বর্ণের উপঢৌকনে কেনা যায় না
ইংল্যান্ডের আইনের মতো তোমার ন্যায়দণ্ড বেচা-কেনা হয় না
তোমার তুলাদণ্ডে ধনী-নির্ধন সমান মূল্য বহন করে।
জ্ঞানের মশাল জ্বলে তোমার হাতে,
ধর্মযাজকের ভুয়া বাক্যের ঝুলি
মিথ্যা প্রমাণ করে দিলে
তোমার রাজত্বে তা দণ্ডনীয় হয় না।
তোমার বহ্নিকে ওরা নেভাতে চেয়েছিল ‘গল্’ দেশে
রক্তের বন্যায় আর স্বর্ণের প্রলোভনে,
কিন্তু তোমার নাম রক্তের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়নি কোনদিন,

শান্তির জীবন্ত মূর্তি তুমি,
স্বর্ণস্তূপে প্রোথিত হয়নি তোমার জয়ধ্বজা।
রক্ত আর অর্থের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে বিকিয়ে দেয় দেশদ্রোহীরা,
তাই বেদনার ভারে নুয়ে পড়ে আছ তোমরা যে মানুষের দল,
দুঃখের বোঝায় অবনত রয়েছে যে মানুষের দল,
তোমরা জাগো,
তোমরা হাত মেলাও বিরাট মিলনভূমিতে,
ঘোষণা করো বজ্রগম্ভীর স্বরে,
ঈশ্বরের রাজত্বে মুক্ত হোক সবাই
গোলাম রইবে না কেউ এই দুনিয়া পরে। (স্বচ্ছন্দ অনুবাদ)

উপসংহার

স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণায় শেলি ও লেনিনের মত অভিন্ন, যদিও শেলি বিশ্বাস করতেন এবং আজও কিছু খ্রিষ্টান বিশ্বাস করেন যে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধেই এই স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব। কিন্তু অন্যেরা আজ, বিশেষ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া সংগ্রামের পর সকলে আমাদের সঙ্গে একমত হবেন যে, স্বাধীনতাকামী মানুষকে সংগ্রামশীল হতে হবে। এই সমস্ত মানুষের সঙ্গেই আমরা সহযোগিতা করতে চাই।

আজ যখন সমস্ত মানুষের সমূহ বিপদ, সেই সময়ে মতবাদগত পার্থক্যকে বাধা হিসাবে মেনে নেওয়া নির্বুদ্ধিতারও বাধা হবে। আমরা এও বলি যে, মতবাদগত পার্থক্য সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করতে চাই। সেই পার্থক্যগুলো কী? আমার মতে আসল সমস্যা, ডিগারদের নেতা উইনস্ট্যানলি 'ঐশী বাণী' সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তারমধ্যে নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে এঙ্গেলস তাঁর *অ্যান্টি ড্যুরিং* বইয়ের শেষ পরিচ্ছেদে যা বলেছিলেন তাই উল্লেখ করে আমি উপসংহার করছি :

'যে সমস্ত বহিঃশক্তি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের মনে তার যে অতি-কাল্পনিক প্রতিফলন পড়ে, ধর্মচিন্তা তাছাড়া আর কিছু নয়। এই প্রতিফলনের পার্থিব শক্তিসমূহ অপার্থিব রূপ গ্রহণ করে। ইতিহাসের প্রথম যুগে প্রকৃতির শক্তিগুলোই এইভাবে প্রতিফলিত হতো, কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জাতির মনে এগুলো নানা ধরনের আকৃতি গ্রহণ করে। অনতিকাল পরেই কিন্তু প্রাকৃতিক শক্তির পাশাপাশি সামাজিক শক্তিগুলোও সক্রিয় হতে থাকে, এবং এই শক্তিগুলোও প্রাকৃতিক শক্তির মতোই মানুষের কাছে গোড়াতে আদিম ও দুর্বোধ্য বলে এবং নৈসর্গিক শক্তির মতোই সমভাবে আপাত-অনিবার্য বলে প্রতিভাত হতো। দুর্জেয় নৈসর্গিক শক্তিসমূহ প্রতিফলিত হয়ে প্রথমে যে সব উদ্ভট মূর্তি গ্রহণ করেছিল সেগুলো পরে সামাজিক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে, ইতিহাসের শক্তির প্রতীক হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। বিবর্তনের আরও পরবর্তীকালে অসংখ্য দেবতার নৈসর্গিক গুণাবলি একটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে গিয়ে বর্তায়, এই সর্বশক্তিমান হচ্ছেন আবার কাল্পনিক মহামানবের প্রতিমূর্তিই। এইভাবেই একেশ্বরবাদের জন্ম হয় ইতিহাসের দিক দিয়ে যা হচ্ছে উত্তরকালীন গ্রিকদের অসংস্কৃত দর্শনের শেষ অবদান-ইহুদিদের জাতীয় দেবতা জেহোবা রূপে যা মূর্তি গ্রহণ করে। এই সুবিধাজনক, কার্যকরী ও সহজবোধ্য রূপেই ধর্ম বহির্বিশ্বের সামাজিক শক্তিসমূহের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তারই

প্রাথমিক অর্থাৎ কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি হিসাবে মানুষের চিন্তায় বেঁচে থাকতে পারে, ততদিন পারে যতদিন পর্যন্ত এই সমস্ত শক্তি মানুষের উপর প্রভাব বজায় রাখতে পারে। আমরা একাধিকবার ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, বর্তমান বুর্জোয়া সমাজে মানুষ তার নিজের সৃষ্টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা-যে উৎপাদনের উপায় মানুষ নিজেই খাড়া করেছে তা দ্বারা সে বহিঃশক্তির মতো যেন পিষ্ট হচ্ছে। মানব-মনে ধর্মীয় প্রতিফলনের প্রক্রিয়ার বাস্তব ভিত্তি তাই এখনও রয়েছে এবং সেই সঙ্গে বেঁচে রয়েছে ধর্মের প্রতিফলন। যদিও বুর্জোয়া রাষ্ট্রনৈতিক অর্থনীতি এই বাহ্যশক্তির কর্তৃত্বাধীন হওয়ার সাধারণ ভিত্তি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করেছে কিন্তু তাতে কোনো মৌলিক পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি। বুর্জোয়া অর্থনীতি সাধারণ সঙ্কটের প্রতিরোধ করতে পারে না, শিল্পপতিদের ব্যক্তিগতভাবে লোকসানের হাত থেকে বা অপরিশোধ্য ঋণ থেকে বা দেউলিয়াপনা থেকে রক্ষা করতে পারে না এবং শ্রমিকদেরও ব্যক্তিগতভাবে বেকারি বা সর্বস্বহীনতা থেকে বাঁচাতে পারে না। আজও একথা সত্যি যে, মানুষ একরকম চায় আর ঈশ্বর (অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদনের বহিঃশক্তি) তার বিপরীত ব্যবস্থা করেন। শুধুমাত্র জ্ঞান, তা যদি বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিজ্ঞানের থেকে অনেক বেশি ও গভীরও হয়, তার দ্বারা সামাজিক শক্তিসমূহকে সমাজের অধীনে আনা সম্ভব নয়। তারজন্য সব থেকে বেশি যে জিনিসের প্রয়োজন হয় তা হচ্ছে সামাজিক সক্রিয় ব্যবস্থা। যখন এই ব্যবস্থা সফল হবে, যখন সমাজ উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে করায়ত্ত করবে ও পরিকল্পনা মাফিক সে সব ব্যবহার করবে, নিজেকে এবং সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে আজকের উৎপাদন ব্যবস্থার হাত থেকে-যে উৎপাদন ব্যবস্থা তারা নিজেরাই সৃষ্টি করেছে কিন্তু আজ যা তার কাছে এক দুর্জয় বহিঃশক্তি হিসাবে দাঁড়িয়েছে—তার থেকে মুক্ত করতে পারবে; যে সময়ে এইভাবে মানুষ যা চাইবে সেই অনুযায়ী তা পাওয়ার ব্যবস্থাও করতে পারবে, সেই দিন মাত্র শেষ যে বাহ্যশক্তি, যা রূপ গ্রহণ করেছে ধর্মের মধ্যে তার অবসান হবে-তার সঙ্গে সঙ্গে মানব-চেতনায় ধর্মীয় প্রতিরূপেরও অবসান হবে, তার সহজ কারণ হচ্ছে সেদিন প্রতিফলিত হওয়ার মতো আর কিছু থাকবে না।